জাগৃহি

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

রেজাউল করীম, এম্. এ. বি. এল

২২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক
সুরেশ চন্দ্র বর্ম্মণ
আর্য্য পাবলিশিং কোং
২২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

১৩৪৫

মুদ্রাকর
শ্রীগৌরচন্দ্র পাল
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫।৭, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

পাঁচসিকা]

নিবেদন

ভারতবর্ষ অর্থে হিন্দু ও মুসলমান। এই দুই সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ ও মিলনের চরম পরিণতির উপর ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। অতএব এই দুই সম্প্রদায়ের মৌলিক তত্ত্ব ও সংস্কৃতি সর্ব্বাংশে বিদিত হওয়া প্রত্যেক ভারতবাসীর একান্ত কর্ত্তব্য।

সুপণ্ডিত বঙ্গসাহিত্যেসেবী মৌলবী রেজাউল করিম এম্, এ, বি, এল সাহেব চিন্তা বৈশিষ্ট্যে ও সমালোচনা নৈপুণ্যে বহুদিন ধরিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত। তিনি গ্রন্থ-সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধে বাঙ্গালার রাজনৈতিক ও হিন্দুমুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে যেরূপ সারগর্ভ মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীরই প্রণিধান-যোগ্য। পুস্তকখানি জাতীয় সমস্যা-সমাধানের দিগদর্শনরূপে গৃহীত হইবার উপযুক্ত। আজকাল অনেকে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধানল জ্বালাইবার ইন্ধন ব্যবহার করিতেছেন; সে অনল নির্ব্বাপিত করিবার জন্য এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বিশেষ প্রয়োজন।

লেখকের কতিপয় মূল্যবান লেখা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এতদিন পড়িয়াছিল। আমরা সে সমস্ত লেখা সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া বঙ্গবাসীর নিকট উপস্থিত করিলাম। পাঠকবর্গ পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করিলে আমাদের প্রচেষ্টা সফল হইল মনে করিব। ইতি—

মহালয়া
১৩৪৫ সাল।

প্রকাশক—

উৎসর্গ

ঋষিকল্প

বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়

মহোদয়ের করকমলে—

সূচী

জাহ্নবী

ধর্ম্ম ও সাহিত্য

মানুষ মাত্রই চিন্তা করে এবং সে তাহার সুচিন্তিত ভাবধারাকে এমন ভাষায় প্রকাশ করিতে চায়, যেন তাহা অপরের বোধগম্য হয়। কিন্তু তাই বলিয়া প্রত্যেক মানুষই কবিও নয়, সাহিত্যিকও নয়। যিনি আপন মনের সুন্দরতম ভাবধারাকে সুন্দরতম ভাষায় প্রকাশ করিতে সমর্থ হন, তিনিই প্রকৃত সাহিত্যিক ও কবি। সাহিত্যেকের ভাব ও ভাষা উভয়ই সুন্দরতম হওয়া চাই। এই দুয়ের একটার অভাব হইলেই তাহা প্রকৃত সাহিত্য পদবাচ্য হইতে পারে না। অনেকের সুন্দরতম ভাব আছে, কিন্তু সুন্দরতম ভাষা নাই, আবার কাহারও সুন্দরতম ভাষাজ্ঞান আছে, কিন্তু সুন্দরতম ভাব নাই—তাঁহারা কেহই প্রকৃত কবি ও সাহিত্যিক নহেন। তাঁহাদের রচনা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের নিদর্শন নহে। এইভাবে ভাব ও ভাষার যিনি অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন, তিনি সকল যুগের সকল মানবের বরণীয় ও অনুকরণীয়। তিনি নানা অর্থে জগদ্বাসীর গুরু, মানবের শিক্ষক, তিনি সকলের শীর্ষস্থানীয়—তাঁহার প্রভাব ত্রিকালব্যাপী, তিনি ত্রিকালজয়ী।

সাধারণ মানুষ যদি তাহাদের সাধারণ জ্ঞানের নিক্তিতে সেইসব মহাকবিগণকে ওজন করিতে যায়, তবে তাহাতে তাহার মুর্খতাই

সূচিত হয়, তাহা ব্যর্থ পরিশ্রমে পর্য্যবসিত হয়। তাঁহারা এত উর্দ্ধে যে, সাধারণের পক্ষে তাহার পরিমাপ করা সম্ভব নহে। কোন্ স্মরণাতীত যুগে বাপীতীরে ক্রৌঞ্চমিথুনের ব্যথাতুর প্রাণের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে গিয়া যে মহাকবি আবেগভরে কাঁদিয়া উঠিয়া প্রথম কবিতার জন্ম দিলেন, যাহার মানস-পুত্র-কন্যাগণ আজ কোটি কোটি মানবের নিকট দেবদেবীর ন্যায় সম্পূজিত হইতেছেন, তিনি কি সামান্য মানুষ? যে জন্মান্ধ কবিটি একটি নারীকে উপলক্ষ্য করিয়া অতীতকালের কয়েকটি জাতির জীবন্ত আলেখ্য আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংসারিক জীবনধারাকে অমর তুলিকায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, সেই হোমার কি সামান্য মানুষ? কালিদাস, সাদী, হাফেজ, ফেরদৌসী, দাঁতে, গ্যেটে, শেক্সপীয়ার, মিলটন, শেলী, কীট্স্ প্রভৃতি যুগপ্রবর্ত্তক সাহিত্যরথিগণ—যাঁহাদের প্রভাবে মানবজীবনের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে নানা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, যাঁহারা নানাভাবে পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাসের গতি ফিরাইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা কি সাধারণ মানুষ? এইভাবে যদি জগতের বড় বড় কবি, মহাকবি ও সাহিত্যরথিদের সন্ধান লই, তবে প্রত্যেক বিষয়ে সাধারণ মানুষ হইতে তাঁহাদের অসাধারণত্ব ফুটিয়া উঠিবে। তাঁহারা সকল যুগেই সাধারণ মানুষের উর্দ্ধে; গৌরব ও মহিমার দীপ্তিতে তাঁহারা সু-উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁহাদের তুলনা নাই, তাঁহাদের জ্ঞানের পরিধি নির্ণয় করিতে যাওয়া বাতুলতা। তুমি আমি সাধারণ লোক, সাধারণভাবে চলি, সাধারণভাবে চিন্তা করি, সাধারণভাবে কথা বলি এবং আমাদের প্রত্যেক কর্ম্মধারাও অতি সাধারণ। আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানদ্বারা কবির মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় না। কি-ই বা বিচার করিব আমরা তাঁহাদের? কতটুকুই বা আমাদের শক্তি?

সাহিত্যরথিগণ তোমার আমার মত নহেন, তাঁহারা আরও উচ্চে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে পথ দেখান, নিরানন্দকে আনন্দ দেন, জীবনকে সুন্দর, মধুর ও সফল করিয়া তুলেন, ঘুমন্ত জাতিকে জাগাইয়া তুলেন। সাহিত্যরথিগণ ও মহাকবিগণ আপনাদের কল্পনার প্রভাবে সাধারণের সম্মুখে এমন আদর্শ রাখিয়া যান, যাহা যুগ যুগ ধরিয়া তাহাদিগকে পথের আলো দেখাইতে থাকে, মরীচিকার মধ্যে সুনিশ্চিত গন্তব্যস্থানে লইয়া যাইতে সাহায্য করে। শৌর্য্য-বীর্য্য, দয়া-দাক্ষিণ্য, মহত্ত্ব, ন্যায় ও সত্য প্রভৃতি মহৎগুণের প্রকৃত আদর্শ ও পরিচয় আমরা পাই, কবির চিত্রিত আলেখ্যে। আর সেই আলেখ্য আমাদের নয়নের সম্মুখে সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত সতত জ্বল্ জ্বল্ করিতে থাকে, তাহারই প্রভাবে আমরা আদর্শের সন্ধান পাইয়া থাকি।

ধর্ম্মের বহিরাবরণের কৃত্রিমতার মধ্যে নিরন্তর বাস করিতে করিতে, আমরা অনেক সময় লক্ষ্যহারা হইয়া পড়ি, পথকেই মনে করি জীবনের চরম ও পরম পরিণতি। পথের শেষে—আরও শেষে যে এক অপূর্ব্ব জগৎ আছে, তাহার সন্ধান রাখি না। যে ব্যক্তি পথের শেষে এই নবজগতের সন্ধান পায় না, সে অপরকে মনে করে পথভ্রষ্ট। কিন্তু এমনও মানুষ আছেন, যাঁহারা আপনার সাধনার বলে অতি সহজে আমাদিগকে অনেক দূর ডিঙ্গাইয়া, পথের সীমা অতিক্রম করিয়া, সেই এক আলোকময় লোকে উপস্থিত হইয়া আমাদের অন্ধকার পথে আলো বিকীরণ করিতে থাকেন—যেন আমরা আর পথভ্রষ্ট হইয়া বিপথে ও বিঘোরে ঘুরিয়া না মরি। কিন্তু তাঁহাদের বিকীর্ণ আলোকের ঔজ্জ্বল্যে আমাদের অনেকের চক্ষু ঝলসিয়া যায়, আমরা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লই—আর এই জ্যোতির্ম্ময়-লোকের মহামানবগণকে ভ্রান্ত, উন্মার্গগামী বলিয়া গালাগালি

দিতে থাকি। তাঁহারা যতই আলো বিকীরণ করিতে থাকেন, আমাদের গালাগালির সীমাও মাত্রা ছাড়াইয়া উঠে—আমরা তাঁহাদিগকে বলি কাফের, শয়তান, নাস্তিক। আর দিনরাত দিই তাঁহাদিগকে অভিশাপ। কিন্তু এই সব 'ফতওয়া'দানকারীর জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী, তাঁহাদের অনেকেই কালের অতল-তলে তলাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নাম-গন্ধও কেহ জানে না, কিন্তু যাঁহাদিগকে কাফের ও নাস্তিক বলা হইয়াছিল, তাঁহারাই আজ জগতের পূজ্য—তাঁহারাই আজ জগতের অন্ধকার দূর করিতেছেন, আর চিরকাল তাঁহারাই ঐরূপ করিবেন। সক্রেটিস প্রাণ দিলেন, যুবকগণকে বিগড়াইয়া দিতেছেন এই অভিযোগে। শেলী নির্ব্বাসিত হইলেন, বিদ্যালয় হইতে নাস্তিকতার সমর্থনে প্রবন্ধ লেখার জন্য—কিন্তু সেই দণ্ডদানকারিগণ আজ কোথায়? নিহত সক্রেটিস ও নির্ব্বাসিত শেলী আজ প্রত্যেকের মনোরাজ্যে সম্রাটের মর্য্যাদা লইয়া বিরাজ করিতেছেন। এই সব পথসর্ব্বস্ব ধর্ম্মধ্বজীদের কারণে পৃথিবীতে কত নিরীহ মহাজনের উপর কত অত্যাচার হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? কত প্রতিভা অকালে নষ্ট হইয়াছে, কত আলোক নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে, কত প্রেরণার উৎস-মুখ নিষ্করুণভাবে শুখাইয়া গিয়াছে—কিন্তু এত অত্যাচার করিয়াও তাঁহারা পথচারী মাত্র—আজ পর্য্যন্ত পথের শেষ তাঁহারা পান নাই। এই সব অত্যাচরিত মহারথিগণ আলোক-লোকের অধিবাসী, ইঁহারাই অম্লান প্রদীপ। যুগে যুগে অত্যাচার হইয়াছে, আজিও হইতেছে, কিন্তু পথচারী, পথচারী ভিন্ন আর কিছুই নহে; আর মহাকবি ও সাহিত্যরথিগণ চিরকালই পথপ্রদর্শক।

মানুষের নৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রিক কল্যাণ সাধনের কৃতিত্ব, ধর্ম্ম-সংস্থাপকের একার নহে। ইহাতে সাহিত্যের দানও

অতুলনীয়। জগতে ন্যায়, নীতি, সত্য ও সামাজিক নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠার জন্য সাহিত্য যাহা করিয়াছে, তাহা ধর্ম্ম-সংস্থাপকের দান অপেক্ষা কোনও অংশে কম নহে। হোমার, ব্যাস, বাল্মীকি, ফেরদৌসী তাঁহাদের অমর তুলিকায় যে সব পুণ্য চরিত্রের আলেখ্য আঁকিয়াছেন, তাহা জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে ও মানবের চরিত্রোন্নতিতে কোনও মহাপুরুষের দান হইতে কম মূল্যবান নহে। সীতা, সাবিত্রী, সোহরাব, রুস্তম, পেনেলোপ, ওডেসাস, টেলিমেকস্ প্রভৃতি উজ্জ্বল-চরিত্র মানবগণ বাস্তব-জগতে ছিলেন কি-না তাহার মীমাংসা ঐতিহাসিকগণ করিবেন। হয়ত ছিলেন না। কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্য এই সব কাল্পনিক ব্যক্তিগণকে মৃত্যুহীন জীবন দান করিয়া এমনভাবে অমর করিয়া গিয়াছেন যে তাঁহারা আজও কোটি কোটি লোকের আদর্শ ও ভক্তির পাত্র বলিয়া আদৃত হইতেছেন—তাঁহাদের পুণ্য চরিত্র, হউক্ তাহা যতই কাল্পনিক, মানবকে সতত পথ দেখাইয়া আসিতেছে। সাহিত্য জাতিকে গড়িয়া থাকে, জাতির জন্য আদর্শ দেয়, তাহার জন্য আইন ও শৃঙ্খলার নিয়ম প্রস্তুত করে। সাহিত্য, শেলীর ভাষায়, "Unrecorded legislature of the world"। সাহিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে ভীরুর প্রাণে সাহস দেয়—সৈনিকের প্রাণে রণোন্মাদনা জাগায়—প্রলোভন হইতে মানুষকে রক্ষা করে—মানবের সমগ্র জীবনের উপর এমন একটা ছায়াপাত করে, যাহার প্রভাবে সে উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠিতে সাহস পায়। সাহিত্য সত্য, সুন্দর, মঙ্গল ও শক্তির প্রচারক, প্রবর্ত্তক ও ন্যায়ের রক্ষক। ইহা মানুষকে আনন্দ দেয়, তাহার চিত্ত গৌরব, মহিমা ও অপার্থিব আলোতে ভরিয়া দেয়।

সাহিত্য বিশেষ কোন ব্যক্তি বা জাতির সম্পত্তি নহে। ইহা সমগ্র মানবজাতির সম্পত্তি। সাহিত্যের কোন ধর্ম্ম নাই, একথা বলি না।

কিন্তু ধর্ম্মকে আমরা চল্‌তি কথায় যে অর্থে সচরাচর ব্যবহার করি, সাহিত্যের ধর্ম্ম তাহা নহে, তাহা ভিন্ন বস্তু। সেইজন্য এক দেশের ও এক সম্প্রদায়ের সাহিত্য, অন্য দেশের জন্য পরিত্যাজ্য নহে, অন্য দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ও তাহাতে সেই আনন্দ, সৌন্দর্য্য ও শিক্ষা পাইতে পারে, যাহা প্রথমোক্ত দেশের লোক পাইয়া থাকে। এই ভাবে সাহিত্য এক দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিশ্বের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যে ধর্ম্মান্ধ মানুষ সাহিত্যের অন্তর্নিহিত সত্য-তথ্যের সন্ধান পায় না, সে-ই মনে করে সাহিত্য তাহার নিজ ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন আদর্শের বাহন হইবে না। তাহার নিকট সাহিত্য কেবলমাত্র তাহারই ধর্ম্মের প্রচারক ও সংরক্ষক; তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তাই দেখি পিউরিট্যান যুগে যখন ধর্ম্মান্ধতা অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গেল, তখন আইন করিয়া বাইবেল ব্যতীত অন্য সব সাহিত্য-সাধনার মুণ্ডপাত করিতে কেহই কুণ্ঠিত হয় নাই। আদিরসাত্মক কবিতা, নাটক ও অভিনয় সবই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তাহাদের দৃষ্টিতে বাইবেলীয়-সাহিত্য ব্যতীত সব কিছু অসার ও নাস্তিকতামূলক, সুতরাং দমনযোগ্য। এইভাবে ধর্ম্মের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইংলণ্ড কিছুদিনের জন্য সাহিত্য, কলা ও শিল্পের সর্ব্বনাশ সাধন করিল, এই ধর্ম্মান্ধতার পরিণাম পরবর্ত্তী যুগে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে লাগিল। যে ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য সাহিত্যকে বধ করা হইল, সেই ধর্ম্মের অবস্থাও ভয়াবহ হইয়া উঠিল। সাহিত্য-দমনের জন্য মানুষের প্রাণের সুকুমার বৃত্তিগুলি নষ্ট হইল, উদারতার স্থানে সঙ্কীর্ণতায় লোকের হৃদয়-মন ভরিয়া গেল, নৈতিক শৃঙ্খলা ছিন্ন হইয়া গেল, নৈতিক আদর্শও ক্ষুণ্ণ হইল। লাম্পট্য ও দুর্নীতিই হইয়া পড়িল লোকের সাধারণ ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম ও সাহিত্য

রোমান্টিক যুগের কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাহিত্য ও ধর্ম্মের অবস্থা এইরূপে শোচনীয় হইয়াছিল। সাহিত্যের এই প্রকার অধঃপতনের কারণেই ধর্ম্মেরও অধঃপতন সম্ভব হইয়াছিল। কারণ সৎ-সাহিত্য ধর্ম্ম নাশ করে না, বরং উন্নত করে ; ধর্ম্মের আদর্শকে পরোক্ষভাবে মহনীয় করিয়া তুলে। ধর্ম্মের নামে সাহিত্যের মুণ্ডপাত করা কোন ক্রমেই উচিত নহে।

কিছুদিন হইতে এদেশে একটা কথা উঠিয়াছে যে, সাহিত্যকে ধর্ম্মের ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে হইবে ; সাহিত্যকে ধর্ম্মের বাহক ও ধারক করিয়া প্রচার করিতে হইবে। যেমন ব্যবস্থাপক সভার গৃহীত আইন, সদস্যদের ভোটের জোরে দেশবাসীর ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হয়, সেইরূপ কতকগুলি ধর্ম্মাচার্য্যের মর্জ্জি মত তাঁহাদের আদর্শকেই সাহিত্যের মধ্যে চালাইয়া দিতে হইবে। তাঁহাদের মতে সাহিত্য হইবে ধর্ম্মের প্রচারক, সমর্থক ও কাঠামো। ধর্ম্মের ভিত্তি ব্যতীত অন্য কিছুরই উপর সাহিত্য দাঁড়াইতে পারিবে না। হিন্দুর লেখা হইবে হিন্দু-সাহিত্য, মুসলমানের লেখা হইবে মুসলিম-সাহিত্য। এইভাবে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গত আদর্শ হইবে সাহিত্যের ভিত্তি। ইহাই যদি হয় সাহিত্যের আদর্শ ও ভিত্তি, তবে একজনের বা এক সম্প্রদায়ের রচিত সাহিত্য অপর সম্প্রদায়ের পড়িবার কোনও আবশ্যক থাকে না। আপন আপন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সাহিত্যই তাহার জন্য যথেষ্ট। এইরূপ মনোভাবকেই বলা হয় 'সাহিত্যে-সাম্প্রদায়িকতা'। সাহিত্যকে ত তাঁহারা ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ ভাবিতে পারেন না। সুতরাং নাস্তিক ও জড়বাদী কোন সাহিত্যই রচনা করিতে পারে না ; আর যদি করিয়াই থাকে, তবে নাস্তিক ও জড়বাদী ব্যতীত অপরের পক্ষে তাহা পাঠ করা পাপ। রাজ-নীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ক্রমশঃ সহ্য হইতেছে, কিন্তু সাহিত্যে এই প্রকার সাম্প্রদায়িকতা একেবারে অসহনীয়। এইরূপ মনোবৃত্তির প্রধান কারণ এই

যে, যাঁহারা অ-সাহিত্যিক, সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহাদের কোনও ধারণা নাই, তাঁহারাই সাহিত্যের প্রত্যেক ব্যাপার দখল করিতে চান এবং নিজেদের মনোবৃত্তি অনুসারে সাহিত্য গড়িতে চান। আমরা ইহা অস্বীকার করি না যে, এই শ্রেণীর লোক মোটামুটিভাবে ধর্ম্মভীরু—অবসর বিনোদনের সময় তাঁহারা কেবল ধর্ম্ম-সাহিত্য পাঠ করেন, তাই মনে করেন যে, ধর্ম্ম-সাহিত্য ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার সাহিত্য হইতেই পারে না। আর যদি কিছু থাকে, তবে পিউরিট্যানদের আদর্শ অনুসারে পরিত্যাজ্য। এই শ্রেণীর লোকের প্রভাব যদি সমাজে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে সমাজ হইতে অচিরে সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ কমিয়া যাইবে, অনেক ক্ষেত্রে অশ্রদ্ধা জন্মিবে এবং সমাজে উৎকটভাবে ধর্ম্মান্ধতার তাণ্ডব নৃত্য হইতে থাকিবে। কতকগুলি সাম্প্রদায়িক ও রাজনীতিক নেতা বাঙ্গালা সাহিত্যের বিরুদ্ধে যে 'জেহাদ' ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা এই প্রকার মনোবৃত্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অ-সাহিত্যিক ও প্রাচীন-পন্থী কাঠ্-মোল্লার দলই ইহার মূলে কার্য্য করিতেছেন।

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, সাহিত্য কোন সম্প্রদায়ের নিজস্ব সামগ্রী নহে, কোনও ধর্ম্মের বাহনও নহে, সাহিত্যের দ্বারা মিশনারী প্রচারকের কাজ চলিবে না। সাহিত্যের নিজস্ব একটা ধর্ম্ম আছে, সাহিত্য কেবল তাহাই প্রচার করিবে। সুতরাং হিন্দু-সাহিত্য, মুসলিম-সাহিত্য, খৃষ্টান-সাহিত্য প্রভৃতি কথার কোনও মূল্য নাই—উহা অলীক ও পরস্পর-বিরোধী ভাব। শেক্সপীয়ার, মিল্টন, শেলী, কীট্‌স্, ব্রাউনিং—ইঁহারা খৃষ্টান; কালিদাস, ভবভূতি, রবীন্দ্রনাথ—ইঁহারা হিন্দু; এবং সাদী, হাফেজ, ফেরদৌসী—ইঁহারা মুসলমান। কিন্তু ইঁহাদের রচিত সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্—তাহা খৃষ্টানেরও নয়, হিন্দুরও

নয়, মুসলমানেরও নয়। ধর্ম্মান্ধদের আদেশ মত যদি তাঁহারা খৃষ্টান বা হিন্দু-সাহিত্য অথবা মুসলমান-সাহিত্য রচনা করিতেন, তবে তাঁহারা সর্ব্বক্ষয়কারী কালের করাল-গ্রাসে পতিত হইতেন। আজ কেহই তাঁহাদের নামও জানিত না। ধর্ম্ম-প্রচারক ও মিশনারীদের প্রচারিত শত শত পুস্তক বাজারে অতি সস্তায় বিক্রীত হইয়া থাকে—কিন্তু কে তাহাদের সন্ধান রাখে, আর কে-ই বা তাহা পাঠ করে? অথচ মহাকবি ও শ্রেষ্ঠ লেখকগণের সাহিত্য জগতের সর্ব্বত্র চির-আদৃত হইয়া থাকে। বিশেষ কোনও দেশ ও বিশেষ কোনও ব্যক্তি হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি হইলেও তাহা প্রচারিত ও প্রকাশিত হইবামাত্রই হইয়া পড়ে নিখিল জগতের সম্পত্তি। তাহা কাহারও একার সম্পত্তি নহে। একজন মুসলমান কালিদাস পড়িয়া যে আনন্দ পাইবে, একজন হিন্দু হাফেজ-রুমি পড়িয়া সেইরূপ আনন্দ পাইবে—এখানে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক বাছ-বিচার নাই। সুতরাং ধর্ম্মকে ব্যাপক ভাবে গ্রহণ না করিয়া সঙ্কীর্ণভাবে গ্রহণ করিলে, আমরা বজ্র-গম্ভীর স্বরে বলিব, ধর্ম্মের সহিত সাহিত্যের কোনও সংস্রব নাই। রোমান ও গ্রীক্ সাহিত্য আসলে গীতি-সাহিত্য, কিন্তু তাহা যে-কোন একেশ্বরবাদীকে সৎশিক্ষা দিতে পারে, তাহার আনন্দ বর্দ্ধন করিতে পারে এবং তাহাকে সৃষ্টিতত্ত্বের অপার সৌন্দর্য্যের রস দিতে পারে। আমরা কথায় কথায় এই যে মুসলিম-সাহিত্যের দাবী করিয়া থাকি, তাহা যদি প্রকৃত সাহিত্যই হয়, তবে তাহা আর মুসলিম-সাহিত্য থাকিবে না, তাহাও হইয়া পড়িবে বিশ্ব-সাহিত্য। প্রেরণার আবেগে না লিখিয়া যদি কাঠ্-মোল্লাদের ফরমায়েস মত, তাহাদের বাহবা পাইবার জন্য কিছু লিখিয়া থাকি, তবে তাহা মুসলিম-সাহিত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা সাহিত্যের খাস-দরবারে

একদণ্ডও টিকিবে না; তাহা কালের অতল-তলে তলাইয়া যাইবে। অ-সাহিত্যিকগণ যদি পদে পদে সাহিত্যিকগণকে নির্দ্দেশ দিতে যান, আর সমাজ যদি মাথা পাতিয়া সেই নির্দ্দেশ মানিয়া চলে, তবে তাহার পরিণাম সমাজের পক্ষে শুভকর হইবে না; সমাজের মধ্যে সাহিত্যিক-দৈন্য উপস্থিত হইবে—সমাজের বুদ্ধিবৃত্তি দেউলিয়া হইয়া যাইবে। সুতরাং আমাদের নবীন লেখকগণকে বিশ্ব-সাহিত্য সৃষ্টির দিকে মন দিতে হইবে, সাম্প্রদায়িক নেতাদের কথায় ভুলিলে চলিবে না। তাহাদিগকে সাহিত্যের চির-শাশ্বত পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নিয়ম কানুন কোর-আন ও হদীসে আছে, কিন্তু তাহাতে সাহিত্য-সৃষ্টির নিয়ম নাই। তাহার জন্য অন্যত্র পাঠ লইতে হইবে। প্রাচীনপন্থীদের নির্দ্দেশক্রমে রচনার প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়াছে। "গোলেবাকাওলী" ও "ছহি ছোনাভান" শ্রেণীর রচনা সমাজকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহাদের দুষ্ট প্রভাব হইতে সমাজকে উদ্ধার করিতে হইবে।

আমরা চাই প্রথম শ্রেণীর লেখকের মত মুসলমানের লেখনী হইতে প্রকৃত সাহিত্য রচিত হউক্। কিন্তু তাহা কাহারও নির্দ্দেশক্রমে নয়, সময়ের প্রয়োজনে নয়, অর্থের প্রলোভনেও নয়; তাহা হইবে অন্তরের প্রেরণা হইতে। সভা করিয়া নির্দ্দিষ্ট পথে রচনার গতিকে বাঁধিয়া দিয়া নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে লিখিতে লেখকবর্গকে বাধ্য করিলে তাহাদের লেখনী হইতে যাহা বাহির হইবে তাহা সাহিত্য হইবে না। সাহিত্য হইবে মানুষের সরল ও অবাধ মনের সহজ বিবৃতি; অবাধ মুক্ত-হৃদয়ের স্বতঃ-উৎসারিত প্রস্রবণ;— মনের ও বিবেকের দাসত্ব সেখানে থাকিবে না, প্রথা ও রীতির বন্ধন সেখানে থাকিবে না, ধর্ম্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতার ভীতি সেখানে ক্রিয়া

করিবে না। থাকিবে শুধু লেখকের স্বচ্ছ মনের অনাবিল ভাবধারা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাহিত্য লেখকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তি যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে মানুষ হয়, সে তাহা হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। সে নিজের অভিজ্ঞতাকে মধুরভাবে সাহিত্যে প্রকাশ করে। তাহাতে সাহিত্য যতটা নিবিড়, সহজ ও স্বাভাবিক হয়, কোনরূপ কৃত্রিমতার চাপে সেরূপ হইতে পারে না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তিনি, যিনি অভিজ্ঞতা ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব পরিহার না করিয়াও এমন এক লোকে আসিয়া উপস্থিত হন, যাহা স্থান ও কালের সীমা দ্বারা আবদ্ধ নহে। গ্যেটে, কালিদাস, হোমার, শেক্সপীয়ার সেই শ্রেণীর সাহিত্যিক। তাঁহাদের রচনার মধ্যে একটা সার্ব্বজনীন ভাব আছে—তাঁহারা কৃত্রিমতার দ্বারা আবিষ্ট হন নাই। স্বাধীনতা তাঁহাদের প্রাণস্বরূপ। সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা আবদ্ধ হইলে, সেরূপ সাহিত্য কেহই রচনা করিতে পারে না। তজ্জন্য চাই স্বাধীনতা, অকৃত্রিম আদর্শ, বিশ্বপ্রেমের প্রেরণা ও সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মনোবৃত্তির মুক্তি। মুসলমান যদি এই দিকে মনোনিবেশ করে, তবে তাহার কালচার, সভ্যতা ও ধর্ম্ম কিছুই নষ্ট হইবে না, অথচ সে সৃষ্টি করিতে পারিবে সুমহান বিশ্ব-সাহিত্য।

ধর্ম্মান্তর গ্রহণ

কিছুদিন হইল ডাক্তার আম্বেদকর একটা প্রকাশ্য সভায় সদলবলে ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় ঘোষণা করিয়া দেশময় একটা তুমুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছেন। এই অভিপ্রায় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বী বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহাকে ও তাঁহার দলস্থ লোকদিগকে নানাভাবে বুঝাইয়া বলিতেছেন যে, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার কোনও কারণ নাই। আবার অন্যদিকে তাঁহার এই চাঞ্চল্যকর ঘোষণায় আশান্বিত হইয়া অন্যান্য ধর্ম্মের ভক্ত-পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,—"আসুন, আমাদের ধর্ম্মে আসুন,— আপনার সকল অসুবিধা দূর হইয়া যাইবে, মনের সকল গ্লানি কাটিয়া যাইবে।" আমরা জানি না, এই দো-টানা স্রোতের মধ্যে পড়িয়া আম্বেদকর কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবেন!

মানুষকে স্বাধীন চিন্তার অধিকার দিতে হইলে, তাহাকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবারও পূর্ণ অধিকার দিতে হয়, নতুবা সে স্বাধীন চিন্তার কোন মূল্যই থাকে না। কিন্তু নিজ নিজ ধর্ম্মকে উদার, মহদ্‌ভাবাত্মক ও সার্ব্বভৌম বলিয়া ঘোষণা করিলেও কোন ধর্ম্মই স্বধর্ম্মের কোন ব্যক্তিকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার অবাধ অধিকার কোনও মতে দিতে চাহে না। বরং স্বধর্ম্মত্যাগীকে নানারূপে নিপীড়িত করিবারই ব্যবস্থা দিয়া থাকে। রাজদণ্ড হাতে থাকিলে স্থলবিশেষে তাহার উপর পশুবলের প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। অন্যথায় নানারূপ সামাজিক শাসনদ্বারা তাহাকে যথোচিত

দণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে। কোন কোন শক্তিশালী জাতি অপরকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সময় স্বাধীন চিন্তার দোহাই দিয়া নিজেদের জন্য যে অধিকার সংরক্ষিত রাখেন, সেই জাতির কোনও লোক যদি স্বেচ্ছায় তাহার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে চায়, তখন কিন্তু তাহাকে সেই অধিকার দেন না। "Cujus regio ejus religio" (দেশের ধর্ম্ম নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা শাসনকর্ত্তারই আছে)—তখন এই নীতিকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। অর্থাৎ কাহারও স্বাধীন চিন্তা ততক্ষণই থাকিবে যতক্ষণ সে আমার মত গ্রহণ করিতে আগ্রহ দেখাইবে। কিন্তু আমার দলভুক্ত কেহ যদি অপর দলে যাইতে চাহে, তখন সে ব্যক্তি সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। ইহাই হইল ধর্ম্মের ইম্পিরিয়াল আদর্শ। বহু পূর্ব্বে এই আদর্শেই অধিকাংশ ধর্ম্ম পরিচালিত হইত। বর্ত্তমানে ইহার তীব্রতা অতটা মারাত্মক না থাকিলেও অধিকাংশ ধর্ম্মই কতকটা ঐ নীতির দ্বারা পরিচালিত। ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিগণ ধর্ম্মকে যে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে, তাহার জন্য অকাতরে প্রাণ বলিদান করিতেও প্রস্তুত হয়, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। সুতরাং এই প্রাণাপেক্ষা ধর্ম্মকে যাহারা বহু চিন্তার পর পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হয়, তাহারা বিনা-কারণে বা হঠাৎ কোন উত্তেজনার বশে যে সেরূপ করে না, তাহা বলাই বাহুল্য। যাহার ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের মূলে কোনও ভীতি বা প্রলোভন থাকে না, তাহাকে আমরা নিন্দা করিতে পারি না। বরং সেরূপ লোক আমাদের কৃপা ও সহানুভূতির পাত্র। তাহার এই ধর্ম্ম-পরিত্যাগের আচরণ দ্বারা এমন কোনও পাপ কার্য্যের আশ্রয় দেওয়া হয় না—যাহার জন্য সে মানবসমাজের বহির্গত জীব বলিয়া বিবেচিত হইবে। কোনও ধর্ম্মের বিশেষ কোন নীতি, শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া—কেহ যদি সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চায়, তবে কাহারও বলিবার

কিছু থাকে না। কিন্তু এই নীতি ও আদর্শের প্রতি অজ্ঞ থাকিয়া কেহ যদি পার্থিব কোনও সুবিধা লাভের জন্যে, বিশেষ-সুবিধা-প্রাপ্ত কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়, আমরা তখনই তাহার কার্য্যকে নিন্দা করি, এবং তাহাকে 'ভণ্ড' বলিয়া থাকি। ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতার সহিত তখন তাহার কোনও সংশ্রব থাকে না,—ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব সে কিছুই বুঝিতে পারে না। ধর্ম্ম তাহার নিকট হইয়া পড়ে একটা অনিত্য পার্থিব বস্তু,—একটা জড় জগতের সামগ্রী! সেই উদ্দেশ্যে কোনও লোকের ধর্ম্মত্যাগকে আমরা কোনও মতেই সমর্থন করিতে পারি না। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের দল পুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে যে ধর্ম্ম প্রচার, তাহাকে আমরা বলি মানবের সরল মনের উপর একটা জঘন্য ধরণের পাপাচরণ।

যে-সব অসুবিধা দেখাইয়া দারুণ মর্ম্মপীড়ার মধ্যে ডাক্তার আম্বেদকর স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা একটু অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হইলেও একেবারেই উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তিনি নিজের জন্য ও তাঁহার দলভুক্ত সহস্র সহস্র উৎপীড়িত ও অনাচরণীয় জাতিদের জন্য চাহিয়াছেন—সমানভাবে সামাজিক সকলবিধ অধিকার, পরিপূর্ণ সাম্য, মৈত্রী ও মনুষ্যত্বের সকল দাবী;—যাহার তুলনায় মন্দির-প্রবেশের দাবী অতি নগণ্য। এই সব দাবী তিনি এতাবৎ পান নাই, তাই তিনি আকুলি বিকুলি করিয়া বিশ্বের চারিদিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিতেছেন, 'কে আছ কোথায়—আমাকে মনুষ্যত্বের এই অধিকার দাও। কে আছ ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ, ঈশ্বরের নির্ব্বাচিত মহাধর্ম্ম,—আমাকে ধূলা হইতে তুলিয়া লও, তোমাদের সমান আসনে ঠাঁই দাও।' তাঁহাকে এই অধিকার দিবার জন্য ছুটিল খৃষ্টান—ছুটিল মুসলমান—ছুটিল শিখ, বৌদ্ধ, আর্য্য ও উদারপন্থী—অর্থাৎ, ইঁহাদের মধ্যে সামাজিক অধিকার,

মানবতার দাবী তুলাদণ্ডের সাহায্যে এরূপ সমভাবে বণ্টিত যেন ইঁহাদের নিজেদের এরূপ কোন সমস্যাই নাই, তাই ইঁহারা ছুটিলেন অপরকে উদ্ধার করিতে। কিন্তু বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করি, ব্যাপার কি সত্যই তাই ?

কোন ধর্ম্মকে নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নহে ; অথবা বিশেষ কোনও ধর্ম্মের হইয়া ওকালতি করিবার জন্য সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতেও চাহি না। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করার সহিত এযুগে মানব-জাতির কতটা কল্যাণ নিহিত আছে, ইহা মানব জাতির নানাবিধ জটিল সমস্যা সমাধান করিতে কতটা সক্ষম, আমরা কেবল তাহাই আলোচনা করিব। নিরপেক্ষভাবে প্রচলিত কতকগুলি ধর্ম্ম-বিষয়ে আলোচনা করিয়া আমার এই ধারণা হইয়াছে যে, কোনও রূপ অসৎ অভিপ্রায়ে কোনও ধর্ম্মেরই মূলনীতি ও আদর্শ রচিত হয় নাই। ইহার আদিম উদ্দেশ্য ছিল—সকলবিধ অন্যায় ও পাপ হইতে মানুষকে উদ্ধার করা। কিন্তু মূলতঃ সকল ধর্ম্ম পবিত্র হইলেও, স্বাভাবিক ভাবে ধর্ম্মের ক্রমবিকাশের মধ্য-পথেই উহা হইয়া পড়িয়াছে উচ্চশ্রেণীর হাতের ক্রীড়নক মাত্র। উহারা ধর্ম্মের বিধিনিষেধগুলিকে নিজের সুবিধামত এরূপভাবে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত করিয়া পরিচালিত করিতে আরম্ভ করিল যে, ধর্ম্ম তাহার সরল সহজ স্বাভাবিক-স্বচ্ছন্দ গতি হারাইয়া ফেলিল এবং নানাবিধ কৃত্রিমতা, আচার পদ্ধতি ও বহিরাবণের চাক্‌চিক্যে প্রকৃত ধর্ম্মকে অতলতলে ডুবাইয়া দিল। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বর্ত্তমান যুগে ধনতন্ত্রের ভিত্তির উপরই পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্ম্ম সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। আর এই ধনতন্ত্রের মূলোৎপাটন করিতে হইলেই ধর্ম্মের অনেকটা অংশ বা শিক্ষা ও আদর্শ যে তদ্দণ্ডেই ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে তাহা ধর্ম্মধ্বজিগণ বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। ইহা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা ধর্ম্মের অংশকে যুগের

প্রয়োজনানুরূপ সংশোধন করিতে বাধা দিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, ধনতন্ত্রের ভিত্তিমূল যতই শিথিল হইতে থাকিবে, তাঁহাদের আচার পদ্ধতিও ততই ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া যাইবে।

কোনও ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের প্রথম যুগে মানুষের মধ্যে ছোট-বড়র, উচ্চ-নীচের যে পার্থক্য ও ভেদাভেদ ছিল, সেই ধর্ম্মের প্রভাবে হয়ত তাহা একেবারেই অপনোদিত হইয়া যাইত। কিন্তু সেই ধনতন্ত্রের ভিত্তিকে সমূলে বিধ্বস্ত করিতে পারে নাই বলিয়া এবং ধনতন্ত্র, অভিজাত-তন্ত্র নিজেদের স্বার্থের জন্তই ধর্ম্মকে কাজে লাগাইয়াছে বলিয়া, ধর্ম্মের সকল প্রভাব নির্ম্মূল করিয়া আবার পৃথিবীতে ছোট-বড়র পার্থক্য প্রকাশ্যভাবে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। একথা অতি সত্য যে, ধনতন্ত্রকে ভিত্তি ও আশ্রয় করিয়া ধর্ম্ম যতদিন পরিপুষ্ট হইতে থাকিবে, ছোট-বড়, উচ্চ-নীচের পার্থক্য ও বংশমর্য্যাদার গর্ব্ব ততদিন পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবে না। সমাজের মধ্যে ধন-বণ্টনের অসামঞ্জস্য হইতে ক্রমে ক্রমে যে পার্থক্য সৃষ্টি হইয়া থাকে, সেই অসামঞ্জস্য সমূলে বিদূরিত করিতে ধর্ম্ম কোনও দিনই সাহায্য করে নাই। বরং ধর্ম্মের বিধানগুলি যেরূপে রচিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, ধর্ম্মের ধনতান্ত্রিক সংস্কারকগণ স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরিয়া লইয়াছেন যে, মানব সমাজে চিরকাল তিন স্তরের লোক থাকিবে—ধনিক, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক। এই তিন অথবা ততোধিক স্তরকে সমাজের মধ্যে চিরকাল অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই ত ধর্ম্মসংস্কারক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। আমরা নাম ধরিয়া কোনও ধর্ম্মকে আক্রমণ করিব না। এ কারণে এই সবের উদাহরণ দেওয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব হইবে না। এক ধর্ম্মের দোষ দেখাইতে গেলে অপর ধর্ম্মেরও দোষ দেখাইতে হয়, নতুবা প্রবন্ধটি পক্ষপাত-দুষ্ট হইয়া পড়িবে। তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম্মের বর্ত্তমান নীতিকে

স্বাধীনভাবে এই আদর্শের দ্বারা যাচাই করিলে আমাদের কথার সারবত্তা বুঝিতে পারিবেন।

যে ধন-বৈষম্য, সামাজিক গলদ, ও অভিজাত-তন্ত্র সমূলে বিনষ্ট না হইলে মানুষের মধ্যে উচ্চ-নীচের পার্থক্য বিদূরিত হইতে পারে না, বর্ত্তমান প্রচলিত কোনও ধর্ম্মই তাহা দূর করিতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধনতন্ত্র ও ধর্ম্ম-বৈষম্যই হইতেছে বর্ত্তমান ধর্ম্মসমূহের মূল ভিত্তি। অথচ এই অধিকার-বৈষম্য দূর করিতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি। বর্ত্তমান যুগে উচ্চ-নীচের মধ্যে এমন একটা যোজনব্যাপী বাধার সৃষ্টি হইয়াছে যে, প্রচলিত কোন ধর্ম্মই সে বাধা দূর করিতে সক্ষম নহে। কারণ, ধর্ম্ম আধ্যাত্মিকতার মহিমান্বিত আসন হইতে কোন্ দিন নামিয়া আসিয়া পড়িয়া গিয়াছে জড়বাদিতার অতল গর্ভে। সুতরাং ডাঃ আম্বেদকর যে-সব অধিকার চাহিয়াছেন, তাহা পাইতে হইলে অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হয়। বর্ত্তমান যুগে প্রচলিত কোনও ধর্ম্মে, দাবি করুক যে যতই উৎকৃষ্ট বলিয়া—কেহই সে মূল অধিকার পাইবে না। মানুষের সহিত সৃষ্ট জীবের, আর তাহার সহিত বিধাতার সম্বন্ধ স্থাপন, এই দুইটী ধর্ম্মের প্রধানতম উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রথমটির চরম মীমাংসা ধর্ম্ম কোনও দিন করিতে পারে নাই ; আর শেষোক্তটির করিয়াছে কি-না, তাহা ধর্ম্মভক্তরাই বলিতে পারেন, তাহা আমাদের আলোচনার বহির্ভূত। নিজ নিজ ধর্ম্মের আদর্শ পালন করিয়া কেহ যদি বিধাতার সান্নিধ্য লাভ করিতে চায়, তবে কেহ তাহাকে বাধা দিতে যাইবে না ; কিন্তু অধিকার-বৈষম্য দূর করিবার জন্য যে আদর্শের দরকার তাহা সে প্রচলিত ধর্ম্মে পাইবে না। তজ্জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ইহা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি।

সামাজিক অধিকারের তারতম্য ও ধন-বৈষম্যের কারণে এই যে

মানবজাতির মধ্যে সতত একদল লোক উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে উন্নীত হইতেছে, ক্রমাগতই ধনাগার পরিপূর্ণ করিতেছে এবং আর একদল লোক এই যে ক্রমাগত অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে, আষ্টেপৃষ্ঠে দারিদ্র্যের বেড়াজালে নিপীড়িত হইতেছে, তাহা সমূলে দূর করিতে হইলে এবং তাহার প্রভাব হইতে মুক্তি পাইতে হইলে একজনকে অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার আবশ্যকতা নাই ; মানুষের ধর্ম্মান্তর গ্রহণে সে বৈষম্য বিদূরিত হইবে না। কারণ তৎসত্ত্বেও সে ব্যক্তি সে অধিকার পাইবে না, ধন-বৈষম্যের কুপ্রভাব হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। যে-সব কারণ পরম্পরায় সে তাহার নিজ ধর্ম্মাবলম্বীর দ্বারা মানবতার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, নবভাবে সে যে-ধর্ম্মই অবলম্বন করিতে যাইবে, তাহাতেও সেই সব অভাব-অভিযোগ পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে, সেই সব কারণ পরম্পরা সে ধর্ম্মেও ঐরূপ ভেদাভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। নিজেদের দল পুষ্ট হইবে বলিয়া এক ধর্ম্মাবলম্বী হয় ত ধর্ম্মান্তর গ্রহণ-প্রয়াসীকে অনেক সুবিধার প্রলোভন দেখাইবে ; কিন্তু সেখানে গিয়া সে কেবলই শুনিবে ফাঁকা আওয়াজ—যে আশায় তথায় যাইবে তাহার কিছুই সে পাইবে না। অপরকে যদি কেহ মানবতার পূর্ণতম অধিকার দিতে উদ্যত হয়, তবে সে তাহার নিজের মধ্যে গোবেচারা কোটি কোটি সর্ব্বহারার দুঃখ-দারিদ্র্য ও অধিকার-বৈষম্যের প্রতি কেন দৃষ্টিপাত করে না? ইহারা যুগ যুগ হইতে যে অধিকার পায় নাই, নব-দীক্ষিতের কেহই সে অধিকার পাইবে না।

ধর্ম্মের নীতি ও পবিত্রতম আদর্শের শোচনীয় ব্যর্থতার আর একটা প্রধান কারণ এই যে, ইহা সপক্ষের সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে যতটা আগ্রহ দেখাইয়াছে, মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতির দিকে ততটা আগ্রহ দেখাইতে পারে নাই। স্বধর্ম্মাবলম্বিগণ দুর্নীতিপরায়ণ হউক, চরিত্রভ্রষ্ট হউক,

তবুও তাহারা আমার দলের লোক—অন্তিমে তাহার মুক্তি নিশ্চয় হইবে—অপরের মধ্যে ধর্ম্ম-প্রচারকগণের মনের ভাব কতকটা এইরূপ। তাই তাঁহারা ঘরের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, তাঁহাদের সমুদয় জীবন ব্যয়িত করেন অপরকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে এবং সেইভাবে নিজেদের দলপুষ্ট করিতে। তাই তাঁহারা নিজ সমাজের নীতিহীনতার জন্য যতটা দুঃখ প্রকাশ করেন না, তাহার চেয়েও তাঁহাদের অধিক দুঃখ এইজন্য যে, অপর লোক তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির স্বাদ পাইল না। "নাই-বা মানিল সে কতকগুলি কঠোর নীতির বিধান, কিন্তু বুলি আওড়াইয়া সে ত প্রকৃত ধর্ম্ম গ্রহণ করিল"—ইহাই হইল আদর্শের সার—ইহাই হইল মুক্তির সোপান। এই ভাবে জগতে ধর্ম্ম প্রচার হইয়া আসিতেছে।

ডাঃ আম্বেদকরের ধর্ম্মত্যাগের কথা শুনিয়া দেশের চারিদিকে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে মনে হাসিও আসে, আবার মানুষের এই নৈতিক দীনতা দেখিয়া দুঃখও হয়। মনে হয়, বিধাতাপুরুষ আমাদের অসাক্ষাতে, অলক্ষ্যে বসিয়া আমাদের এই প্রকার নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া কত হাসিই না হাসিতেছেন।—হায় মানুষ, যুগ যুগ সাধনার পর এই হইল তোমার ধর্ম্মবোধ! ডাঃ আম্বেদকর স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে চাহিতেছেন, তাহাতে তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বীর আক্ষেপ করিবার কি আছে, আর অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরই বা উৎফুল্ল হইবার কি আছে যে, চারিদিকে হৈ হৈ, রৈ রৈ পড়িয়া যাইবে?—ইহার মধ্যে আছে সেই দলহ্রাস ও দলপুষ্টির সম্ভাবনা—নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার বিন্দুমাত্র প্রয়াস নাই। কিন্তু একজন মনুষ্যধর্ম্মী হিসাবে আমি এই ব্যাপারটিকে অন্যভাবে নিরীক্ষণ করিতেছি—এক দল সর্ব্বহারা এক প্রভুর পরাধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া

অন্য এক প্রভুর দাসত্ব স্বীকার করিতে যাইতেছে—ইহাতে তাহার দুর্ভাগ্য ও অধিকার-বৈষম্যের তারতম্য কিছুই হইবে না। তাহার অবস্থা যথা পূর্ব্বম্ তথা পরমই থাকিবে।

আমরা ডাক্তার আম্বেদকরকে ও জগতের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মত্যাগীকেই বলি, তোমরা নিজ নিজ ধর্ম্মের পক্ষপুটের মধ্যে থাকিয়াও মানবতার যে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছ, ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা কোথাও পাইবে না। ধনতান্ত্রিকতার বিনাশ সাধন করিয়া সর্ব্ববিধ অধিকার-বৈষম্য বিদূরীত করিয়া শুদ্ধ মানবতার ভিত্তিতে যদি কোনও দিন জগতে কোনও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সেইখানে সেই অধিকার পাইবে, অন্য কোথাও তাহা পাইবে না। এই নবগঠিত মানব-সমাজে ধর্ম্মগত, জাতিগত ও বংশগত বৈষম্যের কারণে কেহই অপাঙ্‌ক্তেয় থাকিবে না। সেখানে অস্পৃশ্যতা থাকিবে না—সেখানে থাকিবে শুধু মানব-প্রেম—বিশ্বপ্রেম। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—তুমি যে কোনও ধর্ম্মাবলম্বীই হও না কেন, আইস আমরা জগতে সেইরূপ মানব-সমাজ গঠন করিবার জন্য সচেষ্ট হই। জগতের সর্ব্বহারাদের মুক্তির এই প্রকৃষ্ট পন্থা। মানবতার অধিকার হইতে বঞ্চিত মানুষ যেখানে হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভগবানের আসন টলাইয়া দিতেছে, সেখানে কোনও রূপ কৃচ্ছ সাধনাতে ভগবানের সন্ধান পাওয়া যায় না। মানুষকে অশ্রুপাথারে ভাসিতে দিয়া ভগবানের সন্ধান করিতে যাওয়া ব্যর্থ প্রয়াস। এই অধিকারে বঞ্চিত মানুষ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া মুক্তি পায় না। জগদ্দল পাথরের মত যে বোঝা তাহার স্কন্ধে চাপান আছে, তাহা অপসারিত হয় না। গুণতিতে এক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেই কি, আর কাহারও সংখ্যা হ্রাস পাইলেই বা কি, ইহাতে নিপীড়িতের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না। সর্ব্বহারার

দল তাহাদের মূল অধিকার না পাইলে তাহাদেরকে সকল অবস্থাতেই হীন ও পদদলিত হইয়া থাকিতে হইবে।

মধ্য যুগে ধর্ম্মনিষ্ঠ মানুষের একটা প্রধান আদর্শ ছিল, দেশ-বিদেশে ধর্ম্ম প্রচার করা—আপনার মত জগতে প্রচার করিয়া নিজের দল বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্যে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র প্রত্যেকের নিকট প্রভুত চাঁদা আদায় করা হইত। নিজেরা অনাহারে থাকিয়া দরিদ্রেরা এই যে ধর্ম্ম বিস্তার ও প্রচারের নামে চাঁদা দিত তাহাতে কি তাহাদের অবস্থার কোন উন্নতি হইয়াছিল? এক ধর্ম্মের উচ্চ শ্রেণী ও ধনিকবৃন্দ যখন অন্য ধর্ম্মের সেই শ্রেণীর লোককে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন, তখন সর্ব্বহারার প্রতি তাহাদের ব্যবহার ঠিক চোরে চোরে মাসতুত ভাইয়ের মত। আর মধ্য হইতে ধর্ম্ম প্রচারের নামে আর এক শ্রেণীর শোষকের দল বাড়াইয়া দিয়া দরিদ্রেরাই মারা যাইত। যাহারা দরিদ্র তাহারা দীক্ষার পূর্ব্বে ও পরে দরিদ্র ও সর্ব্বহারাই থাকিয়া যাইত। এই উদ্দেশ্যে প্রচারকগণের হাতে দরিদ্র যে অর্থ দিয়াছে, তাহাতে তাহারই দাসত্বশৃঙ্খল আরও সুদৃঢ় হইয়াছে। এযুগের ধর্ম্মপ্রচারও ঠিক এই উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে। তাই ধর্ম্মপ্রচারের ও ধর্ম্মান্তর গ্রহণের শেষ ফল ধনিকদের পুষ্টি আর দরিদ্রের মরণ। এই দর-কষাকষির মধ্যে আধ্যাত্মিকতা বাষ্পের মত উড়িয়া গিয়াছে।

জগতে কোনও ধর্ম্মনৈতিক আদর্শের এতদূর অভাব নাই যে, তজ্জন্য কাহাকে এক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য বিশেষ ব্যক্তি বা গ্রন্থের প্রতি অথবা আচার-পদ্ধতির প্রতি লোকের মনে ভক্তি জাগাইয়া দেওয়া নহে, বরং বিশেষ নীতিপূর্ণ আদর্শের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করা। ব্যক্তি অপেক্ষা আদর্শের উপর অধিকতর গুরুত্ব

দেওয়া কর্ত্তব্য। ব্যক্তি-পূজক অপেক্ষা আদর্শ-পূজক হওয়াই উচিত। এই আদর্শ মানুষ তিল তিল করিয়া সকল ধর্ম্ম হইতে সঞ্চয় করিতে পারে। সেই জন্য কাহাকেও ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার আবশ্যক করে না। এই জন্য আমি মনে করি, একজন একই সময়ে ও একই আধারে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি হইতে পারে—ইহাতে পরস্পর বিরোধী ভাবধারাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইল বলিয়া অভিযোগ করিবার কিছুই থাকে না। সরকারীভাবে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন না করিয়াও মানুষ অপর ধর্ম্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি নিজ সাধনার দ্বারা অর্জ্জন করিতে পারে। ইহার জন্য ঢাক ঢোল পিটাইয়া নাটকীয় আড়ম্বর করিবার দরকার নাই। আর এই জন্য ধর্ম্মের প্রচার বিভাগ খুলিয়া দরিদ্র ব্যক্তির রক্ত শোষণ অর্থ অনর্থক ভোগ বিলাসে নষ্ট করিতে দেওয়া উচিত নহে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হওয়া এই কথাটা তোমার পক্ষে যত সত্য, তাহার চেয়েও গভীর সত্য এই যে, তুমি 'মানুষ'—মহিমান্বিত মানুষ, ভগবানের প্রদত্ত সকল অধিকারে অধিকারী সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষ—অকলুষ নিষ্কলঙ্ক দেবপ্রতিম মানুষ! এই মনুষ্য ধর্ম্মের জয় ঘোষণা কর, এই ধর্ম্মে দীক্ষা লইবার জন্য জগদ্বাসীকে আহ্বান কর—জগতে শান্তি আসিবে, মানুষের ক্রমোন্নতির পথ নিষ্কণ্টক হইবে।

ধর্ম্ম যায় কিসে ?

ধর্ম্ম যে মানুষের ইহ-পরকালের শেষ সম্বল, বিপদে সান্ত্বনা, মুক্তির আশ্রয়, অধ্যাত্ম-লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা, ইহা সকলেই সর্ব্ববাদীক্রমে স্বীকার করিয়া থাকেন। ধর্ম্মের জন্য মানুষ সব রকম ত্যাগ করিতে পারে, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম সাধনায় দেহপাত করিতে পারে—তাই কেহ ধর্ম্মের উপর সামান্য আঁচড়টি পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না। একটু আঘাত দিয়াছ কি তোমার উপর ধর্ম্মভক্তের ক্রোধকষায়িত লোচনের অগ্নিশিখা পতিত হইয়া তোমাকে ভস্মীভূত করিয়া দিবে। ধর্ম্মটা মানুষের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় কি না, সেইজন্য সে পৃথিবীর সমুদয় সুখৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না। সে সব দিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম দিতে পারে না। তাই ধর্ম্মকে এত ভালবাসিলেও, ধর্ম্মের নামে এত করিলেও, একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, বর্ত্তমানে ধর্ম্ম সম্বন্ধে মানুষের ধারণাটা যেন একটু ঘোরাল হইয়া পড়িয়াছে, নিত্য জ্যোতির কাছে থাকিয়া তাহার চক্ষু যেন একটু ঝলসিয়া গিয়াছে, একটু যেন ধাঁধিয়া গিয়াছে। হাজার হাজার বৎসর পর মানুষ আজ ধর্ম্মকে যে অবস্থায় পাইয়াছে ও যে ভাবে পালন করিতেছে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে একটা বিষয় কাহারও দৃষ্টি এড়াইবে না। "ধর্ম্ম কি ?"—ইহার পরিবর্ত্তে "ধর্ম্ম কি নয় ?"—এই কথাটাতেই যেন সাধারণ লোক অধিকতর গুরুত্ব দিতে আরম্ভ করিয়াছে। "ধর্ম্ম কিসে হয় ?"—ইহার চেয়ে "ধর্ম্ম যায় কিসে ?" ইহাই হইয়া পড়িয়াছে আজকাল ধর্ম্মের প্রধান মানদণ্ড—প্রধান সমাধ্য বিষয়।

"ধর্ম্ম কি নয়" এবং "ধর্ম্ম যায় কিসে", ইহার উপর সমস্ত জোর পড়াতে, 'ধর্ম্ম কি' এবং 'ধর্ম্ম কিসে হয়' তাহা বহুলাংশে ধামাচাপা পড়িয়াছে। অনেকে ধর্ম্মের এই জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ দিকটা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে, —ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজকে যত ঘৃণা করে, তাহার তুলনায় ধর্ম্মসম্মত সাক্ষাৎ আদর্শের প্রতি মানুষের আকর্ষণ অত্যন্ত অল্প। ফলে ধর্ম্ম কি নয়, এবং কিসে ধর্ম্ম যায় এইটাই হইয়া পড়িয়াছে আসল সমস্যা, সার বস্তু। আর এই নীতি অনুসারে অবাঞ্ছনীয়কে পরিহার করিয়া চলিতে পারিলেই মানুষ মনে করে যে, সে ধর্ম্মটাকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিবে। এইভাবে সে পরম ধার্ম্মিক হইতে চায়, স্বর্গের তোরণদ্বারে আসিতে চায়।

সেই স্মরণাতীত যুগে ধর্ম্ম সাধকগণের ঐশ প্রেরণার প্রভাবে এবং গভীর আত্মদর্শনের ফলে মানুষের হয়ত পরিপূর্ণ ধারণা ছিল, ধর্ম্ম কি এবং কিসে ইহা সুন্দররূপে প্রতিপালিত হয়। হয়ত সে যুগে ঋষি, মুনি, মহাপুরুষ ও পয়গম্বরগণের সংস্পর্শে আসিয়া মানুষ স্বীয় জীবনের প্রতিটি কার্য্যের মধ্যে ধর্ম্মের পরিপূর্ণ রূপ ও আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিল—ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত সত্যের চরম বিকাশ দেখিয়াছিল ; অতি সুন্দর ও সহজ ভাবেই মানুষের মধ্যে ধর্ম্মভাব পরিপুষ্ট হইয়াছিল। তখন তাহার প্রতি কার্য্যই ধর্ম্মানুমোদিত হইত—ধর্ম্ম ও নীতির মধ্যে তখন কোন রেখা টানা ছিল না ;—যাহা ধর্ম্মসঙ্গত ছিল, তাহাই নীতিসঙ্গতও ছিল। প্রতিদিন যথাযথ-ভাবে ধর্ম্মপালন করিতে করিতে ধর্ম্মটা তাহার তখন হয়ত এরূপ সহজ ও স্বাভাবিক হইয়াছিল যে, সে যাহা করিত তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ ত হইতই না, বরং তাহা ধর্ম্মানুমোদিতই হইত। ধর্ম্ম কি নয়, আর কিসে যায়—এরূপ দ্বিধা তাহার শিশুসুলভ মনকে চঞ্চল করিয়া তুলে নাই—সন্দেহ-কীট আসিয়া তাহার অকপট বিশ্বাসে ঘুণ ধরাইতে পারে নাই। হাজার হাজার

মানুষের মধ্যে কাহার কোন একটা বিষয়ে কি একটা ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটিয়া গেল তাহা লক্ষ্য করিবার মত অখণ্ড অবসর কাহারও হয়ত ছিল না, অথবা লক্ষ্য করিলেও তাহা ক্ষমা করিবার মত উদারতা তাহার ছিল। আবার কোন তীক্ষ্ণদৃষ্টি ব্যক্তির চোখে কোন ত্রুটি ঠেকিলে তিনি হয়ত তাহাকে বুঝাইয়া বলিতেন, ইহা ত তোমার ধর্ম্ম নয়, তোমার স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দগতির পথে ইহা যে একেবারেই নূতন। দেখাইয়া দিলে সে হয়ত তখন তাহা লজ্জার সহিত স্বীকার করিয়া আপন ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ত্রুটিবিচ্যুতি, ভুলভ্রান্তি একটু একটু করিয়া সমাজে প্রবেশ করিতে আরম্ভ হইলে তাহা আর থামিয়া যায় না—বরং ক্রমেই প্রবেশ করিতে থাকে। একটি হইতে অপরটি, তারপর আর একটি এইভাবে রাশি রাশি ভুল-ত্রুটি মানব সমাজে প্রবেশ করিতে লাগিল। পরিশেষে তাহা সংক্রামিত হইয়া পড়িল। ধর্ম্মের শৃঙ্খলা তখন অনেকের নিকট কঠোর বলিয়া বোধ হইল—ভ্রম-প্রমাদ ও ত্রুটিবিচ্যুতি তাহাকে সেই শৃঙ্খলা হইতে মুক্ত করিতে সাহায্য করিল। কঠোরতার তৃপ্তি অপেক্ষা নিয়মভঙ্গের আপাত-রম্য সুখ মানুষকে অধিক আকৃষ্ট করিল। যাহারা ধর্ম্মের গণ্ডী এতটুকু লঙ্ঘন করে নাই, বরং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল তাহারা গভীর পরিতাপের সহিত দেখিল—যদি মানুষ এইভাবে নির্ভয়ে সীমা লঙ্ঘন করিতে থাকে তবে তাহাদের মধ্যে ন্যায়-নীতির আদর্শ আর থাকিবে না। সুতরাং তাহারা বাধ্য হইয়া অপরকে সাবধান করিবার জন্য এই সব ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে মানুষকে সজাগ করিয়া দিল। ধর্ম্মের আদর্শ হইতে উহারা কতদূর সরিয়া গিয়াছে তাহা দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন হইল। তারপর প্রয়োজন হইল এই সব ত্রুটিবিচ্যুতির একটা তালিকা। আর ঐ তালিকার কলেবর ক্রমেই

বাড়িয়া যাইতে লাগিল। ধর্ম্ম কি এবং কিসে পালিত হয়—এই আদর্শ অপেক্ষা ধর্ম্ম কি নয় এবং কিসে নষ্ট হয়—এই ভাবের প্রতি সংস্কারকের দৃষ্টি অধিক মাত্রায় পতিত হইল। আলোর পার্শ্বে অন্ধকার আসিয়া, ধর্ম্মের পার্শ্বে অধর্ম্ম আসিয়া, পুণ্যের পার্শ্বে পাপ এবং সত্যের পার্শ্বে অসত্য আসিয়া মানুষকে দিশাহারা করিয়া দিল। ধর্ম্মই ছিল স্বাভাবিক, এখন তাহাই হইল অস্বাভাবিক। আর যে ত্রুটিবিচ্যুতি তাহাই হইল মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা! সুতরাং ধর্ম্ম কি নয় এবং কিসে নষ্ট হয়, সেই বিষয়ে মানুষকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিবার প্রয়োজন হইল। "ধর্ম্মে মতিমান থাক" বলা অপেক্ষা "অধর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাক" ইহাই হইল সংস্কারকদের উপদেশের ধারা। কিন্তু ইহাতেও যখন লোকে অধর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল না, তখন তাহাকে অসৎ পথ পরিত্যাগ করাইবার জন্য তাহার মনে শঙ্কা জাগাইয়া দিবার প্রয়োজন হইল—ইহা হইতেছে ধর্ম্মচ্যুতির ভয়। তুমি যদি অমুক অমুক পাপ কর, তবে তোমার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে, তোমার ইহ-পরকাল নষ্ট হইবে—ভগবান তোমাকে অনন্ত নরকে নিক্ষেপ করিবেন। ধর্ম্ম কি নয়, আর কিসে নষ্ট হয়, এই বিতণ্ডার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া, ধর্ম্ম কি এবং কিসে পালিত হয়—এই আদর্শ অনেকের নিকট অবহেলিত হইল—রসাতলে ডুবিয়া গেল। ধর্ম্মের 'করিও না' (Negative) এই নিষেধের আবর্ত্তে 'করণীয়' (Positive) বিধি কোন্ অতলে তলাইয়া গেল। জগতের সর্ব্বত্র বর্ত্তমানে যে অবস্থা তাহাতে ধর্ম্মের নিষেধগুলিই হইয়া দাঁড়াইয়াছে সার—আদর্শ আদেশগুলি একরূপ কোণঠাসা! তুমি ধার্ম্মিক ও নীতি-পরায়ণ কি-না তাহা কেহ দেখিতে বড় একটা চায় না, তুমি যদি অধার্ম্মিক না হও, যদি অপকর্ম্ম না কর, তবে তাহাই যথেষ্ট।

'Positive' আদর্শকে পরিহার করিয়া 'Negative' আদর্শকে

অবলম্বন করিলে সর্ব্বত্র আদর্শের ও মূল নীতির যে দুর্দ্দশা হয়, ধর্ম্ম বিষয়েও তাহাই হইতে বসিয়াছে। ন্যায়-নীত, দয়া-দাক্ষিণ্য, ক্ষমা-সৌজন্য প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি ভুলিয়া মানুষ ধর্ম্মের "না" সূচক দিকটা লইয়া সন্তুষ্ট আছে। ধর্ম্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার প্রবৃত্তি নাই, বহিরাবরণকেই সার বস্তু বলিয়া জানিয়া লইয়াছে। দয়ার চেয়ে অত্যাচার হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকা, সংযমের চেয়ে উচ্ছৃঙ্খল না হওয়া, বিনয়ের চেয়ে দাম্ভিক হওয়া, সদালাপের চেয়ে কটুকথা না বলা, ক্ষমার চেয়ে প্রতিহিংসপরায়ণ না হওয়া এই আদর্শ ও শিক্ষাই লোকে সচরাচর পালন করিতেছে। যাহারা এই আদর্শ মানিয়া চলে, তাহারাই আজকাল সমাজে প্রতিষ্ঠাশালী—তাহারাই আদর্শস্থানীয়। "আহা, ঐ লোকটা কত ভাল, কোনও অত্যাচার করে না, কোনও পাপ করে না, ও কাহারও অনিষ্ট করে না,"—এই হইল আজকাল মহৎ ব্যক্তির লক্ষণ! কিন্তু একথা খুব কম লোকেই বুঝে যে 'Positive virtue'ই সারধর্ম্ম। অত্যাচার না করায় কোন ধর্ম্ম নাই, পরোপকারই ধর্ম্ম। সংযম, বিনয়, দয়া, ক্ষমা ইহাই ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য। ধর্ম্মের 'Negative' দিকটার প্রতি অত্যধিক জোর দেওয়াতেই এইভাবে 'Positive' দিকটা অবহেলিত হইতেছে। করণীয় আদর্শ (Positive ideal) এই কারণে খাটো হইয়া গিয়াছে। যতদিন মানুষের মধ্যে করণীয় আদর্শ প্রবল ছিল ততদিন সে ছিল খাঁটি—তাহার সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি সহজেই ধরা পড়িত। কিন্তু এখন নিষেধাত্মক আদর্শ (Negative ideal) তাহার পরিচালক হওয়াতে মানুষের ত্রুটিবিচ্যুতির পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। যাহার নিকট পরোপকারই প্রধান ধর্ম্ম—তাহার ত্রুটিবিচ্যুতি প্রকাশ পায় উপকার না করাতে। কিন্তু অপকার না করাই যাহার ধর্ম্মের আদর্শ, তাহার ত্রুটিবিচ্যুতি প্রকাশ পায় লোকের অনিষ্ট করাতে।

অর্থাৎ তাহার মনের ভাব এইরূপ :—কাহারও উপকার করায় আমার কি দায়, আমি যে তাহার অপকার করি না ইহাই আমার ধর্ম্ম। করণীয় ধর্ম্মের মানদণ্ড অবহেলিত হওয়ার কারণে মানুষের মধ্যে পাপ প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিল। সুতরাং যদি তাহাকে এই পাপের পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে হয়, তবে তাহার মধ্যে আবার সেই করণীয় ধর্ম্মের প্রেরণা দিতে হইবে। কিন্তু এ যুগের সংস্কারকগণ সেদিকে না গিয়া ব্যবস্থা করিলেন দণ্ড দিবার।—সামাজিক শাসন, নানাবিধ নিষেধের বাঁধন—একঘরে করার ভয়,—এই সব। তাঁহাদের এই দণ্ডের বিধান রূপান্তরিত হইল, মানুষের ধর্ম্ম নষ্ট হয় কিসে তাহারই কঠোর ব্যবস্থায়। সেইজন্য আমরা সমাজপতিগণের মুখ হইতে শুনিতে পাই জাতি-পাতের কথা, ধর্ম্মনাশের কথা, সামাজিক বয়কটের কথা। সমাজ-পতিদের নিজেদের জীবনে কত করণীয় কার্য্য অবহেলিত হইতেছে, অত্যাচার, অবিচার, ছলনা, শঠতা, প্রলোভন প্রভৃতি পাপে যে দেশ ভরিয়া যাইতেছে তৎপ্রতি কোন লক্ষ্য নাই ; কিন্তু তুমি একবেলা নামাজ পড় নাই কি, তোমার উপর মৌলবীর কঠোর ফতোয়া আসিয়া পড়িল—তুমি অস্পৃশ্যকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিয়াছ কি, তোমার উপর শাস্ত্রের শাসন-বাণী পতিত হইল। প্রাচীন পন্থীদের এই সব মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন হওয়া দরকার।

দেশের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে ধর্ম্মের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে—লোকের মধ্য হইতে নৈতিক আদর্শ একরূপ লোপ পাইতে বসিয়াছে। এই সময় শাস্ত্রকারগণ যদি এই নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার দিকে মনোনিবেশ করিতেন, তবে কতকটা ফললাভ হইত। কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়া ধর্ম্মনাশের ও জাতি-পাতের ভয় দেখাইয়া

সাধারণ মানুষকে আরও বিভ্রান্ত করিয়া দিলেন। কারণ তাঁহারা এখন ধর্ম্মের করণীয় আদর্শের প্রতি আগ্রহান্বিত না হইয়া, যাহাতে ধর্ম্মনাশ ও জাতিপাত না হয় কেবল ততটুকুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। অর্থাৎ ধর্ম্মের "না" সূচক শিক্ষাই তাঁহাদের নিকট সার হইয়া দাঁড়াইল। শাস্ত্রকারগণের এই প্রকার আচরণ ও অদূরদর্শিতা দেখিয়া হৃদয় দুঃখে অভিভূত হয়। শাস্ত্রগুলি যেন তাঁহাদের একচেটিয়া সম্পত্তি—তাঁহারাই উহার যে ব্যাখ্যা করিবেন, তাহাই যেন চরম ও অপরিবর্ত্তনীয়। তাহার একচুলও এদিক ওদিক হইবার উপায় নাই। অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিলেই তদ্দণ্ডে তোমাকে রসাতলে নিক্ষেপ করা হইবে। সাধারণ বিচারালয়ে হাকিম বসিয়া বসিয়া যেমন কোন আসামীর ফাঁসির ব্যবস্থা করেন, কাহাকেও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, আবার কাহাকেও মেয়াদী জেল দিয়া থাকেন—ঠিক সেইরূপ এই সব সমাজপতি, মৌলবী, মৌলনা, শিরোমণিগণ শাস্ত্র লইয়া বসিয়া থাকেন মানুষকে অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবার জন্য। পার্থক্য এই যে, হাকিমের বিচারের আপীল আছে, কিন্তু ইঁহাদের বিচারের কোনও আপীল নাই। এই সব শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ কি তৎপরতার সহিতই না মানুষের ইহ-পরকালের ভাগ্য নির্ণয় করিয়া থাকেন। কাহাকেও নরকে পাঠাইতেছেন, কাহাকেও জাতি-পাতের ভয় দেখাইতেছেন, কাহাকেও একঘরে করিতেছেন, কোনও কুলবধূকে সমাজ-চ্যুত করিতেছেন, কাহাকেও আবার গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিতেছেন। কোন্ কাজ করিলে, কোন অপরাধ করিলে সামাজিকভাবে কি দণ্ড হওয়া উচিত এ সব গভীর তত্ত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তাঁহাদের নখদর্পণে। ভাবিবার দরকার নাই, কেহ বিচারার্থ নিকটে আসিলেই অমনি ফতোয়া আসিবে—তোমার দণ্ড নরক বাস, অথবা সমাজচ্যুতি ইত্যাদি। তুমি সমুদ্রযাত্রা

করিয়াছ, অস্পৃশ্যের সহিত একত্র ভোজন করিয়াছ, বিধবার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছ, অতএব তুমি ধর্ম্মের বাহিরে, সমাজের বাহিরে। তুমি গান-বাজনা শুনিয়াছ, বায়োস্কোপ সিনেমা দেখিয়াছ, হিন্দুর সহিত মিলিয়াছ, অতএব তুমি কাফের। আলেম ও পণ্ডিতদিগের বদনকমল হইতে এই সব উপদেশ-বাণী নিত্যই নির্গত হইয়া থাকে। বস্তুত সাধারণকে ধর্ম্মে মতিমান রাখিবার জন্য কোনও চেষ্টা করা হয় না ; কিন্তু ধর্ম্মচ্যুতির ভয় দেখাইয়া মানুষের কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে আরও ঘোরাল করিয়া দেওয়া হয়। সাধে কি কোন কোন হরিজন-নেতা ধর্ম্মান্তর গ্রহণের ভয় দেখাইয়াছিলেন! আর সাধে কি তুর্কি বীর আতাতুর্ক কামাল রাষ্ট্র হইতে ধর্ম্মকে একেবারেই পৃথক করিয়া দিয়াছেন! পণ্ডিত ও মৌলবীদের এই সব ধর্ম্মান্ধতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপই দেশে মোল্লা-বিরোধী দল গঠিত হইয়াছে।

এই যে ভারতের সর্ব্বত্র মানুষের সামান্য ভুলত্রুটির জন্য কথায় কথায় ধর্ম্মচ্যুতি ও জাতিনাশের ভয় দেখান হইতেছে, তাহার পরিণাম কি ভারতবাসীদের জন্য একটুও শুভজনক হইবে? ধর্ম্মের নামে অনেককে জোর করিয়া তাহার বিবেকের বিরুদ্ধে কার্য্য করান হইতেছে। ইহার কুফল এই হইবে যে, দেশ হইতে স্বাধীন চিন্তা একেবারেই উঠিয়া যাইবে। আর সামান্য কারণে মানুষের বিবেকের উপর প্রভুত্ব করিলেই কি ধর্ম্ম অক্ষত থাকিবে? বরং ধর্ম্ম যে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য এবং বর্ত্তমানের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে না কেবল তাহাই প্রমাণিত হইবে। সর্ব্বোপরি ধর্ম্মের করণীয় আদর্শের প্রতি জোর না দেওয়াতে মানুষের নীতিজ্ঞান একটুও উন্নত হইবে না। সমস্ত ধর্ম্মের মূল-ভিত্তি নৈতিক আদর্শের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। এই আদর্শ ঠিক না থাকিলে ধর্ম্ম কিছুতেই অক্ষুণ্ণ ও জীবন্ত অবস্থায় থাকিবে না। যাগ-যজ্ঞ, ক্রিয়া-কর্ম্ম, প্রার্থনা-উপবাস,

নমাজ-রোজা প্রভৃতি ধর্ম্মের বহিরাবরণ মাত্র। কেবলমাত্র ঐগুলির উপর ধর্ম্ম দাঁড়াইতে পারে না, উহারও গভীর অন্তর্দ্দেশে প্রবেশ করিয়া প্রকৃত নৈতিক আদর্শের সন্ধান করিতে হইবে। বাহিরের রূপের একটু এদিক ওদিক হইলে, অথবা কোনও অংশ পরিহার করিলে তাহাতে ধর্ম্মের কিছুই আসে যায় না; তাহাতে ধর্ম্মের পবিত্রতা ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য একটুও নষ্ট হয় না। এগুলি ধর্ম্মের মূলনীতি নয়, যুগে যুগে, কালে কালে নানা ঘটনাপরম্পরার মধ্যে ইহার বহুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, এখনও হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। কিন্তু নৈতিক আদর্শ বরাবরই এক ও একই অবস্থায় আছে। এই আদর্শ ঠিক থাকিলে, বাহিরের আবরণ বিনষ্ট হইলে, অথবা পরিবর্ত্তিত হইলে মহাভারত অশুদ্ধ হইবে না। তাহাতে ধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে না—বিপদাপন্নও হইবে না। পোপ-শাসিত খৃষ্টান জগৎ মহাত্মা গ্যালিলিওকে ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল এবং তজ্জন্য তিনি চরম দণ্ডও পাইয়াছিলেন। কিন্তু বহুকাল পরে সেই ইউরোপ তাঁহার গবেষণাই সত্য বলিয়া স্বীকার করিল, অথচ তাহাতে খৃষ্টান ধর্ম্মের একটুও অঙ্গচ্ছেদ হয় নাই। শাস্ত্রকারগণের আদেশ অবহেলা করিয়া লোকে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল। আর মৌলবীদের ফতোয়াকে অমান্য করিয়া অনেকে ইংরেজী শিখিয়াছিল। অথচ তাহাতে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম্মের গৌরব ও মহিমার একটুও ব্যত্যয় ঘটে নাই। বরং যাহারা ভয়ে পিছাইয়া পড়িয়াছিল তাহাদেরই সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল। এত সন্দেহবাদ ও নাস্তিকতার মধ্যেও হিন্দু ধর্ম্ম ও ইসলাম ধর্ম্ম যে টিকিয়া আছে তাহা শাস্ত্রকারগণের প্রগতিবিরোধী প্রচারের ফলে নহে, তাহা ঐ ধর্ম্মদ্বয়ের অন্তর্নিহিত সত্তার জন্য। ধর্ম্মের এই আসল সত্তার সন্ধান লইবার চেষ্টা কর, দেখিবে কেহই তোমার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারিবে না। ধর্ম্ম কাচের

বাসন নয় যে সামান্য একটুকুতেই তাহা চুরমার হইয়া যাইবে। গো-বধ ও মসজিদের পার্শ্বে গান-বাজনা লইয়া সময় সময় এদেশে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়, তাহার মূলে রাজনৈতিক প্রচার থাকিতে পারে (এবং নিশ্চয় আছে) ; কিন্তু একথাও অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকের সত্যকার জ্ঞানের অভাবও তাহার প্রধান কারণ। ধর্ম্মের নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা না থাকাতে হিন্দু-মুসলমান কাহাকেও বুঝাইতে পারা যায় না যে, ইহাতে ধর্ম্মের কিছুই আসে যায় না। আসল ধর্ম্ম এ সবের অতি উর্দ্ধে অবস্থিত।

প্রবন্ধ আর বাড়াইব না—কিন্তু উপসংহারে দেশবাসী হিন্দু-মুসলমানের সমীপে একটা নিবেদন জানাইতে চাই। আজ দেশের সর্ব্বত্র ও সর্ব্ব স্তরে 'Positive' ধর্ম্মের অর্থাৎ ধর্ম্মের করণীয় ও নৈতিক আদর্শের বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। ধর্ম্ম কি নয় ও কিসে যায়—এই অসার বিষয়ে আমাদের অনেক সময় বিনষ্ট হইয়াছে—সমুদয় শক্তি ইহাতেই নিয়োজিত করিতে গিয়া আমরা প্রতিনিয়তই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছি। আজ এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি যেন মনে হয়, আমাদের লক্ষ্যস্থল আমাদের গোচরের বাহিরে। কিন্তু আর নয়—এখন দ্বিগুণ তেজে এই লক্ষ্যস্থলে আসিতে হইবে। এই 'Positive' আদর্শ ব্যতীত তাহা সম্ভব হইবে না। সাধারণের প্রাণে আবার এই নীতিজ্ঞান উজ্জীবিত করিতে হইবে। পাপী ও অনাচারীকে সমাজ ও ধর্ম্ম হইতে বাহির করিয়া দেওয়াতে কোনও কৃতিত্ব নাই—কৃতিত্ব আছে এই জগাই মাধাইকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লওয়াতে। অসার তর্ক ছাড়িয়া এই নৈতিক আদর্শের প্রতি যতই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাইবে, ততই মানুষের ধর্ম্মভাব প্রবল হইবে, ততই মানুষের আত্মার কল্যাণ হইবে।

খলিফা-শূন্য খিলাফৎ

ব্রিটিশ সরকারের কল্যাণে আজকাল চারিদিকে যেমন রাজ্যশূন্য 'রাজা', সাম্রাজ্যশূন্য "মহারাজ" ও ভূমিশূন্য "নওয়াব" প্রভৃতি অর্থহীন উপাধির ছড়াছড়ি হইতেছে, সেইরূপ কতকগুলি লোকের খামখেয়ালীর কারণে "খিলাফৎ" শব্দটিরও প্রচুর অপব্যবহার চলিতেছে। নব্য তুরস্ক হইতে খলিফা পদটি উঠাইয়া দেওয়ার পর, 'খলিফাশূন্য-খিলাফৎ আন্দোলনটা' যে ভূমিশূন্য নওয়াবের মত একটা নিতান্ত অর্থশূন্য শব্দে পরিণত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমানের 'খিলাফৎ কনফরান্সের' প্রতি লক্ষ্য করিলেই বেশ বুঝা যাইবে। পূর্ব্বে যাঁহারা এই 'খিলাফৎ আন্দোলনের' সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহার সংরক্ষণ ও উদ্ধারের জন্য দুর্গম পথের নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, এবং ইহার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত এ যুগের 'খিলাফৎ-ওয়ালাদের' একটা আকাশ পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। ইহার আদর্শকে সফল করিবার জন্য সে যুগে একটা প্রগতিশীল কার্য্যপরিক্রমের আশ্রয় লওয়া হয়; আর আজ সঙ্কীর্ণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কার্য্যপদ্ধতিতেই ইহার পরিসমাপ্তি হইতে বসিয়াছে। যাঁহারা 'খিলাফৎ আন্দোলনের' প্রাণস্বরূপ ছিলেন, উহাকে রূপ দিয়াছিলেন, উহার জন্য নিশিদিন তিল তিল করিয়া আপনার সত্তা সমর্পণ করিয়াছিলেন, নানা কৌশলে তাঁহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া, আজ এমন একদল লোক উহার কর্ণধার হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, যাঁহারা ছিলেন সে যুগে খিলাফৎ আন্দোলনের প্রতিদ্বন্দ্বী। ফলিফার অস্তিত্ব বিলোপের পর যখন খিলাফতের আর কোনও রূপ সার্থকতাই রহিল না, তখন উহাকে কেন্দ্র করিয়া, উহার আদর্শকে খর্ব্ব

করিয়া, উহার সমুদয় কার্য্যপরিক্রমকে লণ্ডভণ্ড করিয়া উহারই চিরশত্রুগণ একটা সঙ্কীর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরণের মতবাদকে জয়যুক্ত করিবার জন্য মুসলমান সমাজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। সেই মৌলানা আজাদ, সেই মরহুম মৌলানা মোহমুদল হাসান, সেই ডাঃ কিচলু, সেই মরহুম মৌলানা মোহাম্মদ আলি ইত্যাদি সাহেবানরা আজ কোথায়? কেহ পর পারের ডাকে চলিয়া গিয়াছেন, আর যাঁহারা এখনও জীবিত আছেন, তাঁহারা আজ খিলাফৎ হইতে নির্ব্বাসিত! আর যাঁহারা সেই সময় খিলাফতের স্বেচ্ছাসেবকগণকে ভ্রান্ত বলিয়াছেন, পদে পদে বাধা দিয়াছিলেন, হিন্দুভাবাপন্ন বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন, তাঁহারা আজ উহার সর্ব্বময় প্রভু হইয়া পড়িয়াছেন। কামাল পাশার অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে যখন 'খিলাফৎ আন্দোলনের' প্রয়োজন ছিল, তখন ইঁহারা কেহই ইহার পৃষ্ঠ-পোষকতা করেন নাই। কিন্তু যখন উহার আর কোন কার্য্যকারিতা রহিল না, তখন একদল সুবিধাবাদী উহার আদর্শকে অবনমিত করিয়া, উহাকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য সক্রিয় করিবার চেষ্টায় রত রহিলেন। ঢাকার নওয়াব, মিঃ শহীদ সুহরাওয়ার্দ্দি প্রভৃতি মহোদয়গণকে যখন খিলাফৎ আন্দোলনের কর্ণধাররূপে দেখি—তখন এই সব কথাই ভাবিতে হয়।

ভারতবর্ষে খিলাফৎ আন্দোলনের প্রথম যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, উহার উৎপত্তির মূল কারণ, ভার্সাই সন্ধির পর তুর্কি-সাম্রাজ্যের ভাগ-বাঁটোয়ারা ব্যাপারে ইংলণ্ডের মন্ত্রি-সভার আচরণ। মিঃ লয়েড জর্জ্জের মন্ত্রিত্ব কালে যখন বিশাল তুর্কি-সাম্রাজ্য খণ্ডবিখণ্ডিত হইয়া গেল এবং খিলাফতের সংরক্ষক তুর্কির প্রতি কোনও সুবিচার করা হইল না, বরং মক্কা, মদিনা প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলি হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা হইল, তখন সেই কার্য্যের প্রতিবাদ ও প্রতিকার করিবার জন্য

ভারতময় যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় তাহারই ফলস্বরূপ স্থায়ীভাবে খিলাফৎ আন্দোলনের সূচনা হয়। শুধু মুসলমান নহে—বরং স্বদেশবাসী মুসলমানের ধর্ম্মানুভূতির প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় নাই বলিয়া সহস্র সহস্র হিন্দুও ঐ আন্দোলনে অকাতরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। তদানীন্তন ব্রিটিশ-মন্ত্রী সভাই ছিল তুর্কি-সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদের মূল মস্তিস্ক। সুতরাং এদেশের বৃটিশ সরকারকে চাপ দিয়া তুরস্কের প্রতি সুবিচার করিবার জন্য ভারতের সর্ব্বত্র ঐ আন্দোলনের প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল। ভারতীয় খেলাফতিগণ আশা করিয়াছিলেন যে, ভারত হইতে বিশেষ প্রতিবাদ পাইয়া ব্রিটিশ সরকার হয়ত তুর্কি সমস্যা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কিন্তু প্রতিবাদে যখন কোনও ফল হইল না, তখন প্রতিকারের জন্য অসহযোগ নীতি অবলম্বিত হইল। এই অসহযোগ আন্দোলনে দলে দলে হিন্দু-মুসলমানগণ যোগ দিয়া যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিল তাহা ভুলিবার বিষয় নহে। প্রত্যেক মুসলমান বুঝিয়াছেন যে, ইসলামের খিলাফৎ অথবা ভারতের বাহিরে যে সব মুসলিম-প্রধান প্রদেশ আছে, তাহার নিরাপত্তার সর্ব্বপ্রধান শত্রু হইতেছে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী। মুসলিম-শাসিত প্রত্যেক দেশের উপর কোনও না কোন ইউরোপীয় শক্তি এরূপভাবে চাপিয়া বসিয়াছে যে, তাহাতে সেই সব দেশের মুসলমানের মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার উপায় পর্য্যন্ত নাই! ত্রিপলি, মিশর, সুদান, সিরিয়া, প্যালেসটাইন, ইরাক প্রভৃতি প্রদেশ বর্ত্তমানে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের লীলাভূমি। সুতরাং খিলাফৎ আন্দোলনের আর একটা প্রধান উদ্দেশ্য হইল—এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলিম প্রদেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে উদ্ধার করা;—আর খিলাফৎ আন্দোলন চলিতেছিল ঠিক সেই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া। খিলাফৎ-আন্দোলনের নেতারা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিলেন যে, সাম্রাজ্য-

বাদের প্রধান ঘাঁটি ভারতবর্ষ যদি পরিপূর্ণ আত্ম কর্তৃত্ব পায়, তবে এশিয়া হইতে ইউরোপের প্রভাব অনেকটা কমিয়া যাইবে ; এশিয়া মুক্তি পাইলে, মিশর ও সুয়েজ খালের গুরুত্ব থাকিবে না, ইত্যাদি অনেক কিছুর পরিবর্ত্তন হইবে। সেইজন্য তাঁহারা হিন্দুদের সহিত সহযোগিতা করিয়া ভারতকে মুক্ত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার বৈধ ও নিরুপদ্রব আন্দোলনে আত্মসমর্পণ করিলেন। সুতরাং দ্বিতীয় অর্থে খিলাফৎ আন্দোলনের আর একটা প্রধান উদ্দেশ্য হইল ভারতের উদ্ধার সাধন করা। উক্ত আন্দোলনের উদ্যোক্তারা স্পষ্টভাবে বুঝিলেন যে, প্রত্যক্ষভাবে এবং সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করিয়া মুসলিম জগতকে উদ্ধার করিতে না পারিলেও, পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষকে মুক্ত করিতে পারিলে, সমগ্র মুসলিম-জগৎ আপনা হইতেই মুক্ত হইয়া পড়িবে। কেন না, তখন ত' আর সে-সব দেশের উপর ইউরোপের কোনও মোহ থাকিবে না! ভারতের কথা মন হইতে একেবারে অপসারিত হইলেও, অনেকেই যে উপরোক্ত কারণে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং এই আদর্শ অনুসারে কংগ্রেসের সাফল্যে প্রকারান্তরে সমগ্র মুসলিম-জগতের উদ্ধার-কার্য্য সাধিত হইবে। কংগ্রেস ইস্‌লামের সংরক্ষক—খিলাফতের তোরণদ্বার—মুসলিম স্বার্থের প্রতীক। এই বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিয়াই খিলাফৎ যুগের সমগ্র নেতৃবৃন্দ বিনা বাক্যব্যয়ে কংগ্রেসে যোগদান করিয়া উহার আদর্শকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

এদিকে যখন ভারতে ফিলাফৎ-আন্দোলন খুব তীব্রভাবে চলিতেছিল, ঠিক সেই সময় অথবা তাহার কিছুদিন পরে—ওদিকে তুরস্কে একটা নাটকীয় অভিনয়ের মত খিলাফতের মুণ্ডপাত হইয়া গেল। নব-জাগ্রত তুর্কি নানা কারণে খিলাফতের ভার লইতে অস্বীকার করিল এবং দেশ

হইতে খলিফার পদ উঠাইয়া দিল। সেই হইতে মুসলিম-জগৎ 'খলিফা-শূন্য' হইয়া আছে এবং কেহই সেই পদ দাবি করে নাই, অথবা তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যস্ত হয় নাই। সুতরাং ভারতে যে উদ্দেশ্যে খিলাফৎ-আন্দোলনের উৎপত্তি হয়, তাহার প্রধান অংশটির আর প্রয়োজন রহিল না,—খলিফাই যখন নাই, তখন খিলাফৎ-আন্দোলনের সার্থকতা কোথায়? আর তাহার প্রয়োজনীয়তাই বা কি? এই ভাবিয়া অনেকে উহা হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু খলিফা-শূন্য খিলাফতের গুরুত্ব কমিয়া গেলেও অনেকে নানা অজুহাত দেখাইয়া উহাকে ধরিয়া রাখিলেন, —কেহ উহারই নামে ব্যক্তিগত স্বার্থ আদায় করিবার জন্য,—কেহ উহার দ্বিতীয়ার্থ টাকে, অথবা উহার পরোক্ষ উদ্দেশ্যকে সফল করিবার জন্য।

একদিকে রাজনৈতিক মুক্তি-লাভ, আর অন্যদিকে খিলাফৎ-উদ্ধার— এই দুই আন্দোলনের কল্যাণে দেশের মধ্যে যে একটা অপূর্ব্ব জাগরণের সাড়া পাওয়া গিয়াছিল, সাম্প্রদারিক মিলনের যে স্বর্ণসূত্র প্রস্তুত হইতে-ছিল, তাহাতে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকে আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে নানা কারণে এমন সব ঘটনা ঘটিয়া গেল, যাহার ফলে, অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইল, এবং দেশময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। দেশের জাতীয় নেতাগণ এই সব ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত,—তুর্কির নব ব্যবস্থার কারণে খিলাফতের অস্তিত্ব টলটলায়মান—সুতরাং খিলাফৎ-আন্দোলনের প্রভাব ক্রমান্বয়ে মন্দীভূত হইয়া আসিল। এই সুযোগে যাহারা এতদিন খিলাফৎ-আন্দোলনের বিরুদ্ধাচারী ছিল, তাহারা এক্ষণে নিজেদের নিভৃত-গুহা পরিত্যাগ করিয়া ইস্‌লামের তথা খিলাফতের প্রধান পাণ্ডা হইয়া উঠিল। অর্থাৎ— খলিফাহীন খিলাফতের সার্থকতা নাই বুঝিয়া, উহার মূল নেতাগণ

খিলাফৎ-আন্দোলনের দ্বিতীয় ও গৌণ উদ্দেশ্য—ভারতের মুক্তির কার্য্যে যখন ব্যস্ত এবং সেই জন্য খিলাফতের কার্য্যে কতকটা ঢিল দিতে আরম্ভ করিলেন, ঠিক সেই অবসরে মধ্যপন্থী ও সুবিধাবাদীরা সমগ্র খিলাফৎ-অনুষ্ঠানটিকে একপ্রকার বিনাবাধায় দখল করিয়া লইলেন এবং প্রতিক্রিয়া-শীল কার্য্যপদ্ধতির দ্বারা উহার সমুদয় আদর্শকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলেন। যেন এতদিন চরম-পন্থা অবলম্বন করিয়া মুসলমানগণ যে পাপ করিয়াছিল, এক্ষণে সুবিধাবাদীর দল প্রতিশোধ সহ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে আরম্ভ করিলেন! তুর্কি-রাজ্যের ভাগ-বাঁটোয়ারার সময় মুসলিম-রাজ্যসমূহের অবস্থা বাস্তবিকই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তদ্দৃষ্টে কোনও ভক্ত মুসলমান নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু এহেন দুঃসময়ে তীর্থস্থান যথা মক্কা-মদিনার পবিত্রতা, স্বাধীনতা হরণের সময়ও সুবিধাবাদীর দল শুধু যে উদাস ছিলেন তাহা নহে—তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে উহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন যে সর্ব্বনাশ হইবার তাহা হইয়া গেল, তখন সেই সুবিধাবাদীর দল তাহাদের এক্‌কালীন পরিত্যক্ত খিলাফৎ অনুষ্ঠানকে নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের কার্য্যে প্রয়োগ করিল। তাই অদ্যকার খিলাফৎ-আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানকে জাতীয়তার ব্রত হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের জয়ঘোষণা করিবার জন্য অবৈতনিক এজেণ্ট স্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে।

খলিফা-পদ রহিত হইলেও, খিলাফৎ-আন্দোলনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এখনও সফল হয় নাই। ভারতের বাহিরের মুসলিম দেশগুলি এখনও সাম্রাজ্যবাদীদের কবলিত। মৌলানা আজাদ, ডাঃ কিচলু, মৌলানা আব্‌দুর রজ্জাক, প্রমুখ অসহযোগ-যুগের নেতৃবৃন্দ আজিও সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় অন্বেষণ করিতেছেন। ভারত যতদিন পরাধীন

ও অমুক্ত অবস্থায় রহিবে, ততদিন সেই সব প্রদেশ ইউরোপের প্রভাবমুক্ত হইবে না। সেই সব মুসলিম রাজ্যগুলির আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব তবেই অপ-সারিত হইবে, যদি কোনদিন ভারতবর্ষ আপনার পায়ে দাঁড়াইতে পারে। সুতরাং ইসলামের উদ্ধারের সর্ব্বপ্রধান উপায় ভারতবর্ষকে মুক্ত হইতে সাহায্য করা। নতুবা কোনও মুসলিম প্রদেশ নিরাপদ রহিবে না। বর্ত্তমানে কংগ্রেসই প্রকৃত প্রস্তাবে খিলাফতের উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিতেছে, কংগ্রেসের সাফল্যেই খিলাফতের সাফল্য। আর কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করা মূলতঃ ইসলামের সর্ব্বনাশ সাধন করা। তাই আমরা সকল সময় কংগ্রেসের সাফল্য কামনা করি—উহার বিজয়গর্ব্বে গর্ব্ব অনুভব করি।

কিন্তু 'খলিফাশূন্য খিলাফৎ-আন্দোলন' তাহার মূল আদর্শভ্রষ্ট হইয়া আজ যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা একটা প্রগতিবিরোধী প্রতিক্রিয়া-শীল অনুষ্ঠান ব্যতীত আর কিছুই নহে। আজ সমগ্র খিলাফৎ-প্রতিষ্ঠানটি সকল সরকারী কার্য্যের সমর্থন করিবার এবং সাম্প্রদায়িক বিবাদ বৃদ্ধি করিবার একটা যন্ত্র-বিশেষে পরিণত হইয়াছে। ইস্‌লামের অথবা মুসলিম রাজ্য সমূহের মঙ্গলের চেষ্টা ত নাই-ই ;—ইহা ভারতে বৈদেশিক প্রভুত্ব অব্যাহত রাখিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তরায় সৃষ্টি করিবার সর্ব্বপ্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছে। জাতীয়তাবিরোধী প্রত্যেক কার্য্য ইহার আদর্শ হইয়া পড়িয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারই ছিল উহার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। আজ তাহার পরিবর্ত্তে, উহা সমাজের সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিতেছে। সুতরাং বর্ত্তমানে আর খিলাফতের প্রয়োজন নাই ; সেই কার্য্য অন্যান্য অনুষ্ঠান গ্রহণ করিয়াছে—তাহাদিগকে সাহায্য করিলেই মুসলমানের কর্ত্তব্য অনেকটা পূর্ণ হইবে।

এবার মহানগরী কলিকাতার বুকে তথাকথিত খিলাফৎ-কনফারেন্সে

যে সব প্রস্তাব আলোচিত হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইবে—উহা উহার মহান আদর্শ হইতে কত নীচে পড়িয়া গিয়াছে। সঙ্কীর্ণ আদর্শের দ্বারা মহান খিলাফতের আদর্শকে ঐরূপভাবে অবনমিত করিবার কি প্রয়োজন ছিল? তাঁহারা অন্য নাম দিয়া সভা-সমিতি করিয়া যদৃচ্ছা চলিতে পারিতেন; কিন্তু খিলাফতকে সামনে রাখিয়া ইস্‌লাম-বিরোধী কার্য্যের আশ্রয় দিয়া বস্তুতঃ তাঁহারা ইস্‌লামেরই অবমাননা করিলেন। হায়! স্বাধীনতা যে ইস্‌লামের প্রাণ, পরিপূর্ণ মুক্তি যে খিলাফতের মূল উদ্দেশ্য, আজ তাহারই কর্ণধাররূপে ঢাকার নওয়াব সাহেব কোন মুখে ঘোষণা করিলেন, "The question of independence is outside the pale of practical politics" অর্থাৎ—স্বাধীনতার প্রশ্ন বাস্তব ক্ষেত্রে কেজো রাজনীতির বাহিরে! ধিক্কার দিতে হয় সেই সমাজকে যাহারা নির্ব্বিকার চিত্তে নওয়াব সাহেবের ঐ সাঙ্ঘাতিক উক্তিকে হজম করিতে পারিল! এই সব তথাকথিত নেতাদের প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের কারণে সমাজের কতদূর অধঃপতন হইয়াছে, ঢাকার নওয়াবের বক্তৃতা তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ—অপ্রতিবাদে সেই বক্তৃতাকে সমাজে প্রচার হইতে দিয়া মুসলমান নিজেদেরই সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে!

একটা কথা ঢাকার নওয়াব সাহেবের জানা উচিত যে, খিলাফৎ-কমিটিগুলি ইসলাম মিশন সোসাইটি নহে। ধর্ম্মপ্রচার উহার উদ্দেশ্য নহে—রাজনৈতিক আদর্শকে পূর্ণ করা উহার একমাত্র ব্রত। কিন্তু রাজনীতিকে ধামা-চাপা দিয়া ঢাকার নওয়াব সাহেব ধর্ম্ম-প্রচার, শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতি বড় বড় বিষয়কে খিলাফতের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া অল্প ব্যয়ে বাজিমাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহা তাঁহার নিতান্ত অনধিকার-চর্চ্চা! আবার ওদিকে সমাজকে লোভ দেখাইয়াছেন—'আমাকে এক কোটি

টাকা দাও, এক লক্ষ জীবন-সদস্য দাও, আর দশ সহস্র স্বেচ্ছাসেবক দাও, দেখিবে—আমি হরিজনদিগকে মুসলমান করিয়া 'কেল্লা ফতে' করিয়া দিব।' হায়! এই বৃথা দম্ভের কি প্রয়োজনীয়তা ছিল তাহা আমরা কিছুই বুঝিলাম না। মুসলমান-সমাজের জন্য করিবার মত কি কোনই কার্য্য নাই যে, সমাজের 'সারপ্লাস এনারজিটুকু' তিনি ব্যয়িত করিতে চান হরিজনদের কাজে? নিপীড়িতের জন্য এতই যদি দরদ জাগিয়া থাকে—তবে তাঁহার সমাজেই (অন্য কোথাও যাইতে হইবে না,এক ঢাকাতেই কত কার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে) তিনি সেবাব্রত করুন—ইস্‌লামের যথেষ্ট উপকার হইবে। যে এক কোটি টাকা তিনি তুলিতে চান, তাহা তিনি দয়া করিয়া যদি কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হাতে দেন, অথবা দরিদ্র মুসলমান ছাত্রের পড়িবার বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন, তবে সমাজের প্রধান অভাব পূর্ণ হইবে! যে সমাজের কোটি কোটি লোক দরিদ্র এবং অন্নকষ্ট, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার প্রভৃতির কারণে পতিত ও হীন অবস্থায় পড়িয়াছে, তাহাদের অবস্থা উন্নত না করিতে গিয়া আরও ঐরূপ কোটি কোটি লোককে সেই সমাজে প্রবেশ করাইয়া সমস্যাকে আরও গুরুতর করিয়া দিয়া ঢাকার নওয়াব সাহেব মুসলমানের কি কল্যাণ করিতে চাহেন? দু'একটা চটকদার কথা বলিয়া বাহবা পাইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে সমাজের কোনও কল্যাণ হইবে না! হিন্দু-মহাসভাও এককোটি টাকা তুলিতে চাহিয়াছে; কিন্তু তাহা ব্যয়িত হইবে হিন্দুদের কল্যাণের কাজে; আর নওয়াব সাহেবের পরিকল্পিত টাকা ব্যয়িত হইবে একটা পণ্ডশ্রম কার্য্যে—সমাজের দারিদ্র্য-সমস্যাকে আরও গুরুতর করিয়া তুলিবার জন্য।

বস্তুতঃ আমরা দেখিতেছি, সমাজের কল্যাণ, মঙ্গল বিধান প্রভৃতির প্রতি নেতাদের দৃষ্টি নাই—দৃষ্টি আছে কি করিয়া বিনাত্যাগে অক্লেশে নেতা

হইতে পারা যায়। ‘খলিফা-শূন্য খিলাফৎ-আন্দোলন’ তাঁহাদিগকে সেই সুযোগ দিয়াছে। প্রকৃত সমাজ-হিতৈষী হইলে তাঁহারা সমাজের কল্যাণের জন্য নানাপথ পাইতেন; কিন্তু সে পথে ইঁহারা যাইবেন না। তাছাড়া পরাধীন আমরা, সমগ্র ইস্‌লাম জগতের ভার স্কন্ধে লইলে আমরা কি বাঁচিয়া থাকিব? তুর্কি সেই ভার হইতে অব্যাহতি পাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছে। আর মুক্ত হইয়া তুর্কি স্বদেশের জন্য যাহা করিতেছে, প্রত্যেক ভারতীয় মুসলমানের তাহাই করা কর্ত্তব্য। বিশ্ব-মুসলিম-সঙ্ঘ, মুসলিম সংহতি প্রভৃতির স্বপ্নে বিভোর থাকিলে আর চলিবে না। উহাতে আমাদের লাভও নাই—মুক্তিও নাই। ইরাকের দৃষ্টান্তেও যদি এদেশের খিলাফৎ-ওয়ালাদের চক্ষু উন্মীলিত না হয়, তবে আর কোনও দিনই হইবে না। সুতরাং মুসলিম-সংহতির কথা ভুলিয়া—আমাদিগকে এক্ষণে শুধু ভারতের মুক্তির কথাই ভাবিতে হইবে। অতএব মুসলমানের প্রত্যেক অনুষ্ঠান যে কার্য্য-পরিক্রম গ্রহণ করিবে, ভারতের মুক্তি তাহার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

জাত্যভিমান

জাত্যভিমানী উচ্চ বংশীয় মানুষ! শির উন্নত করিয়া কোন্ অহঙ্কারে তুমি আজ ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছ? উচ্চবংশের? উচ্চ পদমর্য্যাদার? তুমি যে সাধারণ লোক হইতে কয়েক ধাপ উর্দ্ধে উঠিয়াছ, তাহারই গর্ব্ব করিতেছ? এই গুলিই যদি তোমার গুণ হয়, তোমার নিজস্ব আর যদি কোন গুণ না থাকে, তবে তুমি আমাদের নিকট হইতে সরিয়া যাও! তোমাকে আমরা চাই না; কোটি কোটি নরনারীর মধ্যে তোমাকে বিশেষ ভাবে পরিচিত, চিহ্নিত ও অলঙ্কৃত করিবার আর যদি কোন গুণ না থাকে, তবে তোমাকে লইয়া আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই, তুমি সম্মুখ হইতে দূর হও!

আমরা চাই সচ্চরিত্রতা, স্পষ্টবাদিতা, মনুষ্যত্ব, স্বাধীনতা, আর চাই নিস্বার্থ ভাবে মানব জাতির সেবা। আমরা চাই, মানুষ, সর্ব্ববিধ সাধনা করিয়া মনুষ্যত্ব অর্জ্জন পূর্ব্বক জনসাধারণকে মুক্তির পথে পরিচালিত করিবে। আমরা চাই, মানুষ, নীচভাব, স্বার্থপরতা ও কলুষিত চিন্তার আবিলস্রোতে ভাসিয়া যাইবে না, বরং মস্তক উন্নত করিয়া প্রবাহমান পাপের স্রোতের মুখে বাধা দিয়া জগতকে পাপ মুক্ত করিবার চেষ্টা করিবে। আমরা চাই, মানুষ, শুধু স্বার্থ সিদ্ধির জন্য লেখাপড়া শিখিবে না, বরং লেখাপড়া শিখিয়া পশুত্ব ভাব পরিত্যাগ করিয়া, মনের কলুষ কালিমা, সঙ্কীর্ণতা, নীচতা পরিত্যাগ করিয়া সত্যের বিমল আলোকে হৃদয় পূর্ণ করিয়া আপনি বাঁচিবে, জগতের লোককে বাঁচাইবে—জগতের লোককে আপনা হইতে ছোট জানিয়া নহে, তাহাদিগকে আপনার মত সমান

পদমর্য্যাদাশীল জানিয়া! জাত্যভিমানী মানুষ! তুমি এমনি মানুষ হইতে পারিবে? এমন করিয়া আপনার মধ্যে সদ্‌গুণরাজি আয়ত্ত করিতে পারিবে? যদি পার, তবে আইস, হৃদয়ের মধ্যে পুরিয়া রাখিব। আর যদি না পার, যদি মানুষকে তোমার সমকক্ষতা প্রদান করিতে লজ্জা বোধ কর, তাহা হইলে তোমাদের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই—মানুষের কীট তুমি, তুমি দূর হও।

তুমি পদ মর্য্যাদার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে চাও? আরোহণ করিতে পার ত কর; তুমি বিলাসিতার স্তূপের উপর দাঁড়াইয়া গগনলোকে হাত বাড়াইতে চাও—পার ত, হাত বাড়াও। যেখানে দরিদ্র নরনারী মৃণ্ময় গৃহে পর্ণ শয্যা রচনা করিয়া কোনও রূপে শীত বর্ষার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে, তুমি তাহাদের বুকে বজ্র হানিয়া তাহাদের সামান্য গৃহকে ভূমিসাৎ করিয়া সেইখানে তোমার বিলাস-ভবন রচনা করিতে চাও? কতকাল এরূপ চলিবে? আমার নিকটে সাহায্যের জন্য তোমাকে আসিতে হইবে। তখন তোমার উচ্চ বংশ ও পদমর্য্যাদায় পদাঘাত করিয়া, আমি বলিব, যাও, যাও, সরিয়া যাও! বিশ্বের সভা হইতে সরিয়া যাও—বিধাতার রাজ্য হইতে সরিয়া যাও। তুমি ধর্ম্মের কীট—তুমি মানব সমাজের কীট—তুমি সরিয়া যাও। মানুষ হইয়া তুমি মানুষকে ঘৃণা কর, অবজ্ঞা কর—তুমি সরিয়া যাও! দুখু মোড়ল, সুখু শেখ অতি নিরীহ, অতি সাধু, অতি সজ্জন, তাহারা কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে মানুষ নয়! তাহারা ছোট লোক, তাহারা চাষা, তাহারা মুটে মজুর, কুলি। তাহারা দিন আনে দিন খায়,—তাহারা ছলনা চাতুরী জানে না, তাহারা মামলা মোকদ্দমার ফাঁদে পড়ে না, অপরকে ফেলে না, তাহারা সঞ্চয় জানে না—তাহারা ত মানুষ নয়! তাহারা সৃষ্টির এক অদ্ভুত জীব! কিন্তু ভাই

জাত্যভিমানি—না, না, ভাই নয়—তোমাদিগকে ভাই বলিয়া ডাকিবার আমার ত কোন অধিকার নাই, আমি যে ছোটলোক! হে উচ্চকুলোদ্ভব! দেবতা বলিয়া ডাকিলে ত সন্তুষ্ট হইবে? তোমরা এ সব ছোটলোকদের রাজ্যে থাকিও না—চলিয়া যাও! দেবতা তোমরা, কোনো দেবলোকে চলিয়া যাও! এখানে, আমাদের ছোটলোক প্লাবিত এ রাজ্যে থাকিলে তোমার বংশের কেহই মর্য্যাদা করিবে না; করিতে পারিবে না।

যাহাদেরকে তোমরা অমানুষ বলিয়া ঘৃণা কর, ছোট বলিয়া ডাকিয়া থাক, তাহারা যদি মানুষ নয়, তবে মানুষ কাহারা? দেশের শতকরা ৯৫ জন লোক যাহাদের সমষ্টি, যাহাদের মাথার ঘাম-পায়ে-ফেলা পরিশ্রমে দেশের বড় লোকদের পুষ্টি সাধন হইতেছে, তাহারা যদি মানুষ নয়, তাহা হইলে মানুষ কাহারা? জগতের চারি দিকে চাহিয়া দেখ,—ঐ দেখ হাটে, ঘাটে, পথে, প্রান্তরে কোটি কোটি মানুষ, কেমন নিপুণ ভাবে আপন কার্য্য করিয়া যাইতেছে—কেহ চাষ করিতেছে, কেহ বাজারে দ্রব্যাদি বেচিতেছে,—কেহ মুটেগিরির কাজ করিতেছে, কেহ তাঁত বুনিতেছে, এইরূপ কত লোক কত ভাবে পরিশ্রম করিয়া স্বাধীন ভাবে দিনপাত করিতেছে! ইহারা যদি মানুষ নয়, তবে মানুষ কাহারা?—তোমরা? যাহারা বিলাস ভোগে দিনপাত করিতেছে, যাহারা অলস হইয়া বসিয়া বসিয়া অপরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাওয়াকেই মানব জীবনের চরম সার্থকতা বলিয়া মনে করে—যাহারা আপন বংশ মর্য্যাদার অহঙ্কারে দরিদ্র মানুষকে সর্ব্বদাই হেয় জ্ঞান করে—তাহারা সেই সব পরান্নজীবী পাষণ্ডেরাই প্রকৃত মানুষ? যাহারা আপনাদের মধ্যে কোনরূপ সদ্‌গুণ সঞ্চিত করিতে পারে নাই, দাম্ভিকতা, অহঙ্কার, কুটিলতা ও শঠতা যাহাদের অঙ্গের ভূষণ, সেই সব কুলাঙ্গার কীটগণই কি মানুষের

আদর্শ? হে জাত্যভিমানি! ধন্য তোমাকে! ধন্য তোমার মনুষ্যত্বের আদর্শকে।

হে বংশগৌরবে অন্ধ মানুষ! তোমাদের মনুষ্যত্বের, যাহাই আদর্শ হউক না কেন—তোমরা নিজেদেরকে যতই উচ্চ বিবেচনা কর না কেন—তাহাতে আমাদের কিছুই যায় আসে না—তোমরা আমাদের এই পৃথিবীর কেউ নও। রবি-শশি-গ্রহ-তারকাহসিত এই যে মনোহর আকাশ—আর তাহারই তলে সবুজ ঘাসের মখমলময় বিছানার উপর এই যে কোটি কোটি লোকের আবাসস্থান—এ জগৎ তোমাদের নয়, প্রকৃতির শিশু যাহারা আমার মত মুটে মজুর চাষী যাহারা—তাহাদেরই ইহা!—তাহাদেরই বাসগৃহ ইহা। তাহারাই ইহাকে সুন্দর ও মনোহর বেশে সজ্জিত করিয়াছে, ইহার সুখ, ঐশ্বর্য্য তাহাদেরই কারণে বর্দ্ধিত হইয়াছে ও হইতেছে। ইহার শোভা ও শ্রী তাহাদের মঙ্গলময় স্পর্শে দিব্য রাগে ফুটিয়া উঠিতেছে। এই পৃথিবীতে তোমাদের কোন অধিকার নাই—ইহা আমাদের—আমাদেরি নিজস্ব সম্পত্তি।

সারা জগতের পানে একবার চাহিয়া দেখিবার তোমাদের কখনও অবসর হইয়াছে? জগতের উপর কিসের হাওয়া বহিতেছে, কি বন্যা-প্রবাহ তরতর বেগে ছুটিতেছে—কি ভীষণ ঝটিকা সমগ্র জগতের বক্ষে মহা প্রলয় হানিতেছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার তোমার কি কখনও অবসর হইয়াছে? আজ সমগ্র জগতে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভাবধারা প্রবলবেগে বহিতেছে। উহার প্রবল স্রোতের সম্মুখে তোমাদের জাত্যভিমানের বৃথা আস্ফালন টিকিতেছে কি? টিকিবে কি? সব পণ্ড হইয়া যাইতেছে, সব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে!

তোমরা আপনাকে বড় বলিয়া জান! তোমরা কিসে বড়?

তোমাদের যে হাড়মাসের দেহ, আমাদেরও সেই দেহ। তোমাদের অর্থ আছে? কোথায় সেই অর্থ পাইয়াছ? তোমরা ত শ্রম-বিমুখ জীব, আমাদের লুণ্ঠন করিয়াই ত তোমাদের ধন। আমরা নিজে পরিশ্রম করিয়া খাই—তোমরা অপরের অর্জ্জিত অন্ন ভোগ কর—এই হিসাবে তোমাদের চেয়ে আমরাই বড়।

উচ্চ নীচ, ছোট বড় বলিয়া জগতে কোন ভেদ নাই—কোন ভেদ থাকিতেই পারে না। ক্ষমতা, বাহু বল, ছলনা, চাতুরী বলে কতক ব্যক্তি উর্দ্ধে উঠিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও সরল প্রকৃতির মানুষকে পায়ের তলে চাপিয়া তাহাদের বুকের রক্ত শোষণ করিয়া আপনাদিগকে 'ভদ্র' ও 'শরীফ' বলিয়া পরিচয় দিতেছে ; কিন্তু তাহারা মূলতঃ এই 'ছোটলোক'দের মত একই স্থান হইতে ও একই মূল হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। কেন তবে তোমরা, হে জাত্যভিমানি! দরিদ্র ও গরীব লোকদিগকে, ছোট লোক, ছোট জাতি বলিয়া ঘৃণা কর? উহারা যে তোমাদেরই বংশধর!

জাতের অভিমান করিও না, জাতি লইয়া আস নাই, জাতি রাখিয়া যাইবে না—যাইতে হইবে মনুষ্যত্ব রাখিয়া! সেই মনুষ্যত্ব লাভের চেষ্টা কর! কবির কথায় "আবার তোরা মানুষ হ"। যদি তোমরা প্রকৃত মানুষ হইতে চাও, তাহা হইলে তোমাদেরকে অনেক কাজ করিতে হইবে ;—পৃথিবীর অনেক অভাব পূরণ করিতে হইবে। তোমরা হৃদয়ের পশু ভাব দূর কর ; ন্যায়, সত্য প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিত হও! তোমরা পরকে আপন করিতে শিখ—যাহাদিগকে ছোট বলিয়া ঘৃণা কর, তাহাদিগকে বুকে টানিয়া লও! ইহাতে অপমান নাই—বরং সম্মান বাড়ে। তাহাদিগকে 'মানুষ' ভাবিতে শিক্ষা কর—তোমরা দরিদ্রের বন্ধু হও! আর্ত্তের সখা হও—পীড়িতের চিকিৎসক হও। রোরুদ্যমানের অশ্রু মুছাইয়া দাও!

তোমরা কি মনে কর, দরিদ্র ও পতিত মানুষ তোমাদের কাছে আসিয়া পায়ে সাধিয়া তোমার দয়ার দান গ্রহণ করিবে?—তোমার নিকট মুক্তির বাণী শ্রবণ করিতে চাহিবে? সেই দিন আর নাই বন্ধু,—সেই দিন আর নাই? সময় আসিয়াছে, দরিদ্রেরা, তথাকথিত ছোট লোকেরা আপনাদের দাবী দাওয়া কড়ায় গণ্ডায় এখন বুঝিয়া লইবে। তোমরা দেনা শোধ দিবার জন্য প্রস্তুত হও।

———

বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থা

বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থা যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তাহা প্রমাণিত করিবার জন্য একদল লোক যেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তেমনি ইহা যে একেবারেই অপদার্থ, অচল ও বহু ত্রুটিবহুল তাহা প্রমাণ করিবার জন্য অন্য একদল লোক চেষ্টা-চরিত্রের কোনও রূপ ত্রুটি করিতেছেন না। এই দুইটি পরস্পর বিরোধী নীতির মধ্যে কোনটা সমর্থনযোগ্য এবং ইহাদের মধ্যে কোনও রূপ মাঝা-মাঝি পন্থা অবলম্বন করা যায় কিনা তাহা গভীর ভাবে বিবেচনা করিবার বিষয়।

বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার ভক্তদের মতে ইহা এত নিখুঁত ও ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য যে ইহার কোন অংশের কোথাও সামান্যরূপ পরিবর্ত্তন বা রহিত করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা যুক্তি দেখান যে, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বহু চিন্তা, গবেষণা ও পর্য্যবেক্ষণের পর যে ব্যবস্থা পরবর্ত্তীগণের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর এতটুকু চূণকাম করি-বারও দরকার করে না,—তাহা অক্ষয়, অব্যয়, তাহা সর্ব্বকালোপযোগী। সুতরাং তাঁহারা বলেন, যাহারা এই অপরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে চাহে তাহারা ধর্ম্মদ্রোহী, নাস্তিক। আবার যাঁহারা এই ব্যবস্থাকে অপদার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারা বলেন, ইহাকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেওয়া উচিত। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্যে এক প্রকার সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাকে সেই অতীত কালের উপযোগী করিয়া রূপ দেওয়া হইয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগে যখন মানব জাতির সভ্যতার ধারার পরিবর্ত্তন হইল, তখন সেইরূপ

সমাজ ব্যবস্থা আর চলিতে পারে না। সে যুগের অবস্থার যখন সকল অংশেরই পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তখন পূর্ব্বেকার সমাজ ব্যবস্থার সামান্য একটু পরিবর্ত্তন করিলে চলিবে না, উহার আমূল সংস্কার করা প্রয়োজন, সমাজ ব্যবস্থাকে একেবারেই নূতন করিয়া গড়িতে হইবে, নতুবা মানব জাতির কল্যাণ নাই।

যাহা বিধাতার বিধান ও প্রকৃতির নিয়ম, তাহা যে চির সত্য, চির শাশ্বত ও চির পালনীয় তাহা আমরা অস্বীকার করি না। সুতরাং বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যেগুলি ঐরূপ চির সত্য ও চির শাশ্বত সেগুলি পরিবর্ত্তন সাপেক্ষ নহে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। সেই জন্য যখন কোনও বিষয় পরিবর্ত্তনের কথা বলা হয়, তখন আমাদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, সমাজ ব্যবস্থা করিয়া আমাদের মধ্যে যে সব রীতি-নীতি, আচার, পদ্ধতি, প্রথা, অভ্যাস, প্রভৃতি প্রচলিত আছে তাহার সবগুলিই কি ঈশ্বর প্রেরিত চিরন্তন আইন, অথবা তাহার বহুলাংশে যুগের ও অবস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষের নিজের তৈয়ারী করা কার্য্য পদ্ধতি। যুগের প্রয়োজন মত যদি অতীতের কোনও মানুষ বা জাতি কোন রীতি নীতি বা প্রথাকে অবলম্বন করিয়া থাকে তবে পরবর্ত্তী যুগের লোক তাহাকে চির শাশ্বত অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে। মানব-সভ্যতার ক্রম বিকাশের ধারা অনুযায়ী যাহা আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন ও সংশোধনের মধ্য দিয়া বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া ক্রমাগত বিভিন্ন যুগ অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান যুগে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাকেও সেই আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তনের নিয়মের বশবর্ত্তী হইতে হইবে। আমরা মনে করি বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থা তাহার বিকাশের এরূপ চরম পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই যে ইহার আর কোনও পরিবর্ত্তন হইবে না।

বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থা

জগতের নানা দেশের শাসন পদ্ধতির মূল উৎস সম্বন্ধে যেমন নানা জনের নানা মত, সেইরূপ মানব জাতি কেন, কবে এবং কি অবস্থার মধ্যে সামাজিক জীবন পাইয়াছে এ-সম্বন্ধেও সকল পণ্ডিত একরূপ সিদ্ধান্ত দিতে পারেন নাই। তর্কিভূত বিষয় পরিহার করিতে চাই বলিয়া মানবের সামাজিক জীবনের উৎস কোথায় সে বিষয়ে উপস্থিত আলোচনা করিব না। মানব-জন্মের সহস্র সহস্র বৎসর পরে যখন তাহার সভ্যতা, কৃষ্টি, ধর্ম্ম, আচার, পদ্ধতি রীতিমত ভাবে বিকশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময়কার বিষয় স্মরণ করিতে হইবে। তখন মানবের সামাজিক জীবন সবে আরম্ভ হইয়াছে, দেশ ও রাষ্ট্রের শাসনাধীনে আসিয়াছে—লোকের শাসনের জন্য আইন প্রণয়ন আরম্ভ হইয়াছে—ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতার মর্ম্ম সে বুঝিতে শিখিয়াছে। মানুষের যখন এইরূপ অবস্থা তখনকার যুগের কথা স্মরণ করিতে হইবে।

আজ মানব সমাজের সম্মুখে যেরূপ নানা সমস্যা আসিয়া দেখা দিয়াছে, তখন যে এ-সব ছিল না তাহা অস্বীকার করা যায় না। তখন জনসংখ্যার তুলনায় লোকের অভাব ছিল অল্প, তাই জীবন সংগ্রামও এরূপ প্রবল হয় নাই। তখন মানুষকে সংযত ও শাসনের মধ্যে রাখিবার জন্য যে সব আইনের প্রয়োজন হইয়াছিল, রাষ্ট্র-শক্তি তাহা দিয়াছিল। পরস্পরের মধ্যে নৈতিক বন্ধন বলবৎ করিবার জন্য যে সব বিধান দরকার হইয়াছিল, তাহা ধর্ম্ম দিয়াছিল। তা'ছাড়া সামাজিক শাসনের জন্য কতকগুলি বিধিনিষেধ, ধর্ম্মের বিধানগুলি সহজে পালন করিবার জন্য কতকগুলি আচার পদ্ধতি, ক্রিয়া-কলাপ, পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলার জন্য কতকগুলি নীতি ও ব্যক্তিগত আইন—এই সবই মানুষ প্রয়োজনের অনুরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সকল আইন কানুনগুলি পালন করিয়া

হয়ত সে যুগের মানুষের অনেক উপকার হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি আসিয়াছিল। এই সব যাহা হইয়াছিল তাহা সেই যুগেরই প্রয়োজন মত।

তারপর আরও কিছুকাল গত হইলে অন্য এক যুগ আসিল, যাহার অভাব অভিযোগ, প্রয়োজন সুবিধা পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ হইতে একেবারেই ভিন্ন ধরণের। এবং তাহার প্রতিকারের জন্য পূর্ব্বাবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা অনুভূত হইল। নুহের (Noah) যুগ, দাউদের যুগ, মুসার যুগ, যিশুর যুগ, ইস্‌লামিক যুগ, প্রাক্-বৈদিক যুগ, বৈদিক যুগ, রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ, মনুর যুগ, রঘুর যুগ, প্রভৃতি বিভিন্ন যুগের আচার পদ্ধতি ক্রিয়া-কাণ্ডের মধ্যে নানাবিধ পরিবর্ত্তন বিবর্ত্তনের নিয়ম অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পরবর্ত্তী যুগ, পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের অনেক কিছু পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং তৎস্থানে অনেক কিছু নূতন ভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছে। মানুষকে পরিচালিত করিবার জন্য, আচার পদ্ধতি সকল যুগেই প্রয়োজন মত পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। আর এই পরিবর্ত্তনের ধারা কখনও বন্ধ হয় নাই, অনাগত কালেও তাহা বন্ধ হইবে না। সুতরাং বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার বেলায় সেই পরিবর্ত্তনের ধারা কেন চিরতরে বন্ধ হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। পরিবর্ত্তন সকল যুগেই হইয়াছে, এবং প্রত্যেক যুগই কোনও প্রকার পরিবর্ত্তনকে বিনা বাক্য ব্যয়ে গ্রহণ করে নাই। কিন্তু মানুষ পরিবর্ত্তিত অবস্থায় যখন কোন সমাজ ব্যবস্থাকে গ্রহণ করিয়াছে, তখন সেই যুগের লোক সেই ব্যবস্থাকে পরবর্ত্তী যুগের জন্য অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছে। তাহারা নিজেদের প্রয়োজনকেই মনে করিয়াছে তাহাই ভবিষ্য বংশীয়গণের জন্য যথেষ্ট। তাই পরবর্ত্তী যুগের লোকদের জন্য কোন ব্যবস্থাকে পরিবর্ত্তন করিবার পথ

চিরতরে বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগ সে নিষেধ শুনে নাই। এই ভাবেই বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে পৃথিবীর সকল দেশের সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে। সুতরাং সেই পরিবর্ত্তনের পথ এ যুগের জন্যও বন্ধ হইতে পারে না। আমাদের অব্যবহিত পূর্ব্ব-বর্ত্তীগণ যে সব ব্যবস্থাকে তাহাদের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় নাও হইতে পারে। প্রয়োজন বোধে এই সমাজ ব্যবস্থার অনেক কিছুকে আমরা ভাঙ্গিয়া চূরিয়া গড়িয়া লইতে পারি—আর তাহা এখন করিবারই প্রয়োজন হইয়াছে।

সেই অনাদি কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ঠিক আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ পর্য্যন্ত যদি কোন নিয়মাবলী সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্ত্তিত ও অসম্পূর্ণ ভাবে অবিকল একই আকারে বিদ্যমান থাকিয়া যায়, নীতি হিসাবে না হইলেও, বাস্তবতার দিক হইতে আমরা না হয় সেগুলিকে শাশ্বত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু তদ্ব্যতীত যে সব বিষয় যুগে যুগে পরিবর্ত্তনের আবর্ত্তে ওলট-পালট খাইতে খাইতে আজ ভিন্ন প্রকার মূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, সেগুলিকে প্রয়োজনের অনুরূপ করিয়া পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিবার অধিকার আমাদের আছে। মানুষ কোন বিধানকে পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার এক যুগে পাইলে এবং তাহার পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা স্বীকৃত হইলে, অন্য যুগেও কেহই মানুষকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। বর্ত্তমান যুগেও আমরা সেই অধিকার ও ক্ষমতা পাইতে চাই। ইহাতে ধর্ম্মদ্রোহী হইবার কোনও ভয় নাই। সমাজ ব্যবস্থা বলিয়া আজ যে সব আচার-পদ্ধতি, ক্রিয়াকাণ্ড আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত

আছে, যদি কেহ প্রমাণ করিতে পারে যে, সেইগুলি সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও ঠিক ঐরূপ অবস্থায় ছিল, তবে না হয় সেগুলির চিরন্তন হওয়ার দাবী কতকটা টিকিতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের দিক দিয়া কেহই তাহা প্রমাণ করিতে পারিবে না। বরং তাহার বিপরীত কথাই প্রমাণিত হইবে। সুতরাং আমরাও এ যুগের প্রয়োজনের অনুরূপ সে যুগের সমাজ ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্ত্তন করিবার সম্পূর্ণ ভাবে অধিকারী।

এক মানুষের সহিত অপর মানুষের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, একের সহিত অপরের ঘনিষ্ঠতা কতদূর নিবিড় হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে সাধারণ কয়েকটি আদর্শ সার্ব্বজনীনভাবে প্রদত্ত হইলেও ইহার খুঁটিনাটি বিষয় প্রত্যেক যুগেই বিভিন্ন আকারে গৃহীত হইয়াছে। অবশেষে ধর্ম্মের মূল আদর্শকে পদদলিত করিয়া সমাজ ব্যবস্থা এক মানুষের সহিত অপরের মধ্যে এরূপ এক ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে যে তাহার শেষ পরিণতি দাঁড়াইয়াছে মানব-বিদ্বেষে, অসার বংশ মর্য্যাদায় ও কলুষিত স্বার্থপরতায়। বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় উচ্চ নীচের মধ্যে অভিজাত ও নিম্ন জাতের, ধনী ও নির্ধনের মধ্যে, মূল ধনী ও শ্রমিকের মধ্যে, জমিদার ও প্রজার মধ্যে, পরগাছা-প্রায় মধ্যবিত্ত ও শ্রমপরায়ণ মজুরদের মধ্যে যে আকাশ পাতাল পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে চিরন্তন শাশ্বত নীতি ও বিধাতার অভিপ্সিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বলিয়া অম্লান বদনে স্বীকার করিয়া লইতে বিবেকে বাধে। বরং এইরূপ অসাম্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে বিবেক উত্তেজিত করে। যে সমাজ ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকাতে এই সব অন্যায় সম্ভব হইয়াছে, তাহাকে পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার ত্রুটি বিচ্যুতি বিদূরিত করিবার জন্য যদি কেহ অগ্রসর হয়, তবে কোনও মতেই সে ধর্ম্মের ও ঈশ্বরের বিরোধিতা করে না, বরং ধর্ম্মের মূল আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করে।

ধর্ম্মধ্বজীদের অগোচরেই হউক অথবা গোচরেই হউক, শত সাম্যবাদ-নীতি থাকা সত্ত্বেও এই যে পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ বিবাদ নির্লজ্জ নগ্নতায় প্রকটিত হইয়া মানুষের শান্তি সুখের নিরন্তর ব্যাঘাত উৎপাদন করিতেছে ইহাকেই কি চিরন্তন নীতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? এই অবস্থার পরিবর্ত্তন আনয়ন করিবার জন্য ধর্ম্ম ও সমাজ ব্যবস্থার যে কোনও নীতিকে আমূল পরিবর্ত্তন ও সংস্কার অথবা রহিত করিয়া দিতে হইবে। বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার আরও অনেকগুলি নীতিকে আমূল পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে। বর্ত্তমানে নারীজাতি যে নিকৃষ্ট স্থান সমাজে অধিকার করিয়া আছে, তাহা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। সামাজিক বহুবিধ অধিকার হইতে নারীজাতি চিরবঞ্চিত—সমাজ ব্যবস্থার সেই সব অংশ পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে সকল অধিকার দিতে হইবে। আমাদের দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে উত্তরাধিকার আইন প্রচলিত আছে তাহা যে ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ তাহা একটা বিষয় হইতে জানিতে পারা যাইবে যে, এই আইন অনেক নিকটতম আত্মীয়কে বঞ্চিত করিয়া দূরতমকে সম্পত্তির অংশ দিয়াছে। এই আইনকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সর্ব্বকালোপযোগী বলা যায় না। ইহার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া যুগের প্রয়োজনের অনুরূপ আইন রচনা করিতে হইবে। সম্ভব হইলে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের জন্য একইরূপ আইন রচিত হওয়া কর্ত্তব্য। Personal Law বলিয়া যে সকল আইন প্রচলিত আছে তাহারও অনেকগুলির পরিবর্ত্তন দরকার। এ সম্বন্ধে যে সকল বিধান এতাবৎ আমাদের সমাজকে পরিচালিত করিয়া আসিতেছে তাহা নানা কারণে অচল ও বিঘ্নকর হইয়া পড়িতেছে। এ যুগের সহিত তাল রাখিয়া তাহা আর চলিতে পারে না। এ যুগের উপযোগী করিয়া

নূতন বিধি গঠন করিতে হইবে—যেন অধিকার-বৈষম্য অপসারিত হইয়া যায়।

বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার অন্ধ-ভক্তগণের দুইটি উক্তি, ব্যক্তিগত চুক্তি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতা রক্ষা করিতে গিয়া জগতে যে অধিকার বৈষম্য উদয় হইয়াছে, তাহার মূল নীতিকে চির শাশ্বত আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে। ইহাকে ধর্ম্মদ্রোহিতা বা সমাজদ্রোহিতা বলে না, কারণ ঈশ্বর এই সব হইতে বহু দূরে অবস্থিত। আর সমাজের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাহা করা যাইবে তাহা সমাজদ্রোহিতাও হইতে পারে না। আমরা মানব সমাজের জন্য এমন এক যুগের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি যখন সমগ্র মানব, ধর্ম্ম ও কার্য্য-পদ্ধতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িবে। বিভিন্ন রুচি ও মত বিশিষ্ট লোকও যেমন এক একটি পরিবারের অঙ্গ সৌষ্ঠবের হানি করে না, বরং তাহার শোভা ও মাধুর্য্য বৃদ্ধি করে, সেইরূপ এমনও যুগ আসিবে যখন এক একটি পরিবারে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সন্তানের কেহ খৃষ্টান, কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান, কেহ বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মের সেবক হইয়াও পরস্পরের মধ্যে পরম সদ্ভাব, প্রীতি ও ভালবাসার মধ্যে কালাতিপাত করিবে। শত আম্বেদকার আসিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণের ভয় দেখাইয়াও মানব সমাজের সে অনাবিল সুখ শান্তির বিঘ্ন ঘটাইতে পারিবে না। সমাজ ব্যবস্থাই সৃষ্টির সার বস্তু নহে, ধর্ম্মের বহিরাবরণই এক মাত্র কাম্য বস্তু নহে—ঐগুলি উপায় বা পথ, গন্তব্য স্থান নহে। গন্তব্য হইতেছে মানবের কল্যাণ, জগতের কল্যাণ।

———

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য

সরকারী দপ্তরখানার অধীনে থাকিয়াও, নানাবিধ আন্দোলন ও সংগ্রাম দ্বারা যে কয়েকটি স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান সরকারের সর্ব্বগ্রাসী প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ না হউক, আংশিকভাবে মুক্তি পাইয়া আজিও সগর্ব্বে মাথা তুলিইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের মধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করা যাইতে পারে। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানকে আপনার কুক্ষিগত করিবার জন্য সরকারের তরফ হইতে নানাবিধ চেষ্টা হইয়া আসিতেছে এবং তাহার ফলে উহাদের স্বাতন্ত্র্য ও আত্ম-কর্তৃত্ব অনেক খর্ব্ব হইয়াছে; কিন্তু তথাপি উহাদের কিছু স্বাধীনতা এখনও অব্যাহত আছে। সেটুকুও খর্ব্ব না হওয়া পর্য্যন্ত যে উহাদের বিরুদ্ধে নানারূপ ষড়যন্ত্র চলিতে থাকিবে, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। কিছুদিন পূর্ব্বে "মোস্‌লেম-স্বার্থের" নামে করপোরেশনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হইয়াছিল তাহার মূল এইখানে; আবার সেই 'মোসলেম-স্বার্থে'র নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে 'মোসলেম-স্বার্থের' অজুহাতে যে আন্দোলন হইয়া আসিতেছে, তাহা মুসলমানকে বাস্তব কিছু দিতে পারে নাই। কিন্তু পরোক্ষভাবে অন্যেরা তদ্দ্বারা লাভবান হইয়াছে। এই সব স্বায়ত্ব-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান—বিশ্ব-বিদ্যালয় ও কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হইতেছে তাহার ফলে মুসলমানের প্রকৃত স্বার্থ একটুকুও সংরক্ষিত হইবে না, এবং উহাদের

স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা নষ্ট হইলে মুসলমানের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। আমরা সর্ব্বদাই এই ভয় করিতেছি।

দেশস্থ বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা-নিকেতন ও স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে শাসকবর্গের কর্ত্তৃত্ব যতই দূর হয় ততই মঙ্গল। রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক নানা কার্য্যে ব্যস্ত কোনও সরকারই নিজ তত্ত্বাবধানে এই সব বিষয় সুচারুরূপে দেখিতে পারেন না বলিয়া, এবং এই সব পরিচালনা করিবার জন্য যে যোগ্যতা থাকা দরকার, তাহা সরকারের থাকে না, অথবা থাকা সম্ভব নহে বলিয়া প্রত্যেক স্বাধীন দেশ এই সব প্রতিষ্ঠানকে পরিপূর্ণ ক্ষমতা দিয়া থাকেন। সরকারের হাতে যে চরম ক্ষমতা সংরক্ষিত থাকে, তাহা নাম মাত্র। প্রয়োজনের সময় অর্থ ব্যতীত অন্য কোনও কারণে এগুলি সরকারের মুখপানে চাহিয়া থাকে না। ইহাদের এই স্বাতন্ত্র্যকে কেহই হিংসার-চক্ষে দেখে না, বরং রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। এই প্রকার স্বাতন্ত্র্য লাভ করার ফলে ইহাদের কাজ আরও ভাল হয়, পদে পদে উপরিওয়ালার খোঁচা খাইবার ভয় থাকে না বলিয়া ইহারা স্বাধীন ভাবে নানারূপ পরিকল্পনা করিতে পারে—নানা কার্য্য পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারে—তাহাতে ইহাদের বিশিষ্ট সভ্যদের প্রতিভার স্ফুরণ হয়, কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ইহাদের উপর যে সীমাবদ্ধ কার্য্যের ভার দেওয়া হয়, তাহা অতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। ভুল-ত্রুটির মধ্যেও ইহারা যে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা লাভ করে, তাহা ভবিষ্যতে জাতির কাজে প্রযুক্ত হয়। এই স্থান হইতে উন্নীত হইয়া এই সব সদস্য বৃহত্তর কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সময় তাহাদের এই অভিজ্ঞতা কাজ দেয়। বলিতে কি এইভাবে দেশের জন্য বড় বড় কাজ করিবার যে যোগ্যতার প্রয়োজন হয়, জাতি

এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান হইতে তাহা শিখে—এইখানে তাহাদের 'হাতে-খড়ি' হয়। বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই নীতি অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অপরাপর প্রতিষ্ঠানের বেলায়ও এইরূপ নীতি প্রযোজ্য। কিন্তু পরাধীন দেশ হইতে কি এরূপ আশা করা যাইতে পারে? তাই এদেশের কোনও স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব পায় নাই। বিশ্ববিদ্যালয় ত কোন ছার। কাহারও কাহারও উদারতার কারণে সামন্য যা একটু ক্ষমতা পাইয়াছে, তাহাও আবার পরবর্ত্তীকালের মুরুব্বির প্রভাবে বিনষ্ট হইয়াছে। এই সংঘর্ষের মধ্যে এগুলি আজিও কোনওরূপে টিকিয়া আছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বর্ত্তমানে 'মোসলেম-স্বার্থের' নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার মূল উদ্দেশ্য—বিশ্ববিদ্যালয়ের এই যৎকিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্যটুকু নষ্ট করা। আমাদের এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। যাঁহারা কিছুদিন পূর্ব্বে কর্পোরেশনের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিবার জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন, এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনটাও তাঁহাদেরই কারসাজি। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়, এই আন্দোলনটা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু-প্রাধান্যের বিরুদ্ধে। হিন্দুরা মুসলমানদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য করে না, তাহাদের অনুভূতির কথা চিন্তা করে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি অভিযোগ তুলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারের ভিতরে প্রবেশ করিলে বুঝা যাইবে, আসল কথা তাহা নহে। কারণ ইহাই যদি আসল উদ্দেশ্য হইত, তবে তাহার প্রতিকারের জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করিলে চলিত। তাহাতে ফলও হইত। ইহার মূল উদ্দেশ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ব্যাপারে

সরকারকে হস্তক্ষেপ করিতে বলা, যেন ইহার শেষ ক্ষমতাটুকু লোপ পায়—যেন ইহার প্রত্যেক কার্য্য রাইটার্স বিল্ডিংয়ের দপ্তরখানার দ্বারা পরিচালিত হয়। যেসব বিষয়ে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। বর্ত্তমানে যে আইন আছে, তাহাতে সরকার ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। এই সব অভিযোগ তুলিয়া সরকারকে বলা হইল, হুজুর আমাদের মা-বাপ, একবার আমাদিগকে উদ্ধার করুন। আমাদের অভিযোগের প্রতিকার করুন—ইহার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুন। এই আবেদনের সোজা অর্থ এই যে, আইন প্রণয়ন দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুন। সরকার বাহাদুর এমনই দয়ালু যে, একবার হস্তক্ষেপ করিতে পাইলে নাবালক বিশ্ববিদ্যালয়কে সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত হয়ত উহার সমুদয় কর্ত্তৃত্ব নিজ হাতেই গ্রহণ করিবেন। সরকারী হস্তক্ষেপের শেষ পরিণাম যে ইহাই হইবে, তাহা ভাবিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিতেছি। সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হইতেছে, তাহাতে মুসলমান সমাজ যাহাতে যোগদান না করে তজ্জন্য আমরা পূর্ব্বাহ্নেই সাবধান করিয়া দিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর কয়েকটি প্রধান বিষয়ে সরকারের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আছে। ইহার মধ্যে সরকারের তিনটি অধিকার ঘোর আপত্তিজনক। প্রথম ভাইস্-চ্যান্সেলার নিয়োগ। দ্বিতীয় অধ্যাপক নিয়োগে সরকারের শেষ অনুমতি। তৃতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাসমূহে সরকারের নিজের লোক মনোনীত করিবার অধিকার। কোথায় দেশবাসী আন্দোলন করিয়া সরকারের এই সব কর্ত্তৃত্ব তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিবে—তাহা না করিয়া দেশের এক শ্রেণীর লোক সরকারকে হস্তক্ষেপ করিতে

বলিয়া তাহার আত্ম-কর্তৃত্ব নষ্ট করিতে সাহায্য করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই গণতন্ত্রের যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা সরকারের হাতে থাকা মোটেই উচিত নহে। অন্যান্য প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের মত এই গৌরবান্বিত পদটি সিনেট-সভার দ্বারা নির্ব্বাচিত হওয়াই উচিত। সরকার এই ক্ষমতাটির কি ভাবে অপব্যবহার করিতেছেন, তাহা ধীরভাবে ভাবিবার বিষয়।

তারপর অধ্যাপক নিয়োগের কথা। বর্ত্তমানে অধ্যাপক নিয়োগের জন্য সরকারের শেষ অনুমতির প্রয়োজন আছে। ইহাতে বাস্তবক্ষেত্রে নানা বিষয়ে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। কোন্ ব্যক্তি যোগ্য কি-না তাহা নির্ণয় করিবার যোগ্যতা সরকার অপেক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের অধিক। কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া সরকার অনেক সময় যোগ্যতম ব্যক্তির নিয়োগ নাকচ করিয়া দিয়াছেন। উদাহরণ-স্বরূপ আমরা মরহুম এ, রসুল্ ও স্যার আবদুল্লাহ সুহরাওয়ারদির কথা বলিতে পারি। বহু বৎসর পূর্ব্বে ইঁহারা যখন দেশের কথা ভাবিতেন এবং দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু সরকার তাহার বিশেষ ক্ষমতা বলে সেই নিয়োগ নাকচ করিয়া সমগ্র মুসলমান সমাজকে অপমান করেন। এই সে দিনও তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা নিযুক্ত একজন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের নিয়োগ নাকচ করিয়াছেন। সরকারের এই অধিকার যতদিন থাকিবে, ততদিন বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শ্রেষ্ঠ সুধীবর্গের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে। তাছাড়া এই অধিকার আরও প্রসারিত হইয়া, যাঁহারা বর্ত্তমানে কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদের উপরই যে প্রযুক্ত

হইবে না, তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। সর্ব্বশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের মত স্থানে সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি থাকিবারও কোনই দরকার নাই। এই সব মনোনীত ব্যক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল—তাঁহারা দেশের কল্যাণ অপেক্ষা সরকারের মুখের দিকে তাকাইয়া কাজ করেন। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহাদের দৃষ্টি এই সব মারাত্মক ত্রুটির দিকে নাই। বরং তাঁহারা সরকারের হাতে বিশ্ববিদ্যালয়কে সঁপিয়া দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানের শত অভিযোগ থাকা সত্ত্বে, আমরা ইহার স্বাতন্ত্র্য নাশের কোনও আন্দোলনে যোগদান করিতে পারি না। এই সব অভিযোগ আরও কিছুকাল থাকে সেও ভাল—কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যেন সরকারের সর্ব্বগ্রাসী কবলে না আসে। কারণ একবার সরকারের কবলিত হইলে, তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া কষ্টকর হইবে। হিন্দুদের দ্বারা চালিত হইতেছে বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে হিন্দু-প্রাধান্য একটু অধিক মাত্রায় হইয়াছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। তজ্জন্য ইহাকে 'হিন্দু-প্রতিষ্ঠান', 'কাশী-বিদ্যাপীঠ' ইত্যাদি যাহা বলিতে চাও, তাহাই বল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহার উপর সরকারী কর্ত্তৃত্ব মুহূর্ত্তের তরেও সহ্য করিব না। মুসলনানের শত অসুবিধা সত্ত্বেও ইহার স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিব। মনস্বী স্যার আশুতোষের সেই অমর উক্তি—"Freedom first, freedom second and freedom last" যেন সর্ব্বদাই আমাদের মনে থাকে।

তর্কস্থলে আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে "হিন্দু-প্রতিষ্ঠান" বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইলাম। কিন্তু যাহারা ইহাকে এত বড় করিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে, তাহাদের আচরণ কি এতই নিন্দনীয় যে ইহার

ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত করিয়া দিতে হইবে? এ-কথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হিন্দুদের নিকট বঙ্গবাসী মুসলমান তিনটি কারণে চিরঋণে আবদ্ধ থাকিবে:—(১) বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সৃষ্টির সময় হইতে অদ্যাবধি ইহারা নানাভাবে সরকারের সহিত সংগ্রাম করিয়া এবং কখন কখন সরকারের শ্যেন্-দৃষ্টিতে ধূলা দিয়া ইহার স্বাতন্ত্র্য, আত্ম-কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে, এবং কতকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছে। সেই যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত মুসলমানের তথাকথিত নেতারা শিক্ষা বিষয়ে যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, তাঁহাদের হস্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার থাকিলে ইহা এত উন্নত হইতে পারিত না, ইহা হয়ত সরকারী দপ্তরখানার নির্দ্দেশ অনুসারে পরিচালিত হইত। (২) ইহা যে মক্তব মাদ্রাসায় পরিণত হয় নাই, বা ঐ ধরণের মধ্যযুগীয় শিক্ষা-নিকেতনের আকার লাভ করেন নাই, তজ্জন্যও ইহার পরিচালকের নিকট আমরা ঋণী। বিশ্ববিদ্যালয় এখনও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু তদ্ব্যতীত ইহা Liberal educationএর উপর ঝোঁক দিয়া দেশের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টাতেই যে, দেশে শিক্ষার প্রতি এত আগ্রহ বাড়িতেছে ও দেশের অন্ধকার দূর হইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবারে কোনই উপায় নাই। বর্ত্তমানে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ব্রিটিশ-ভারতের মধ্যে এক নবযুগের সূচনা করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় একদল মৌলবী-মোল্লা এবং পণ্ডিত ও গুরুমহাশয় সৃষ্টি না করিয়া ছাত্রদেরকে বর্ত্তমান যুগের ভাবধারার সহিত পরিচিত করিয়াছে, তাহা ইহার অশেষ কৃতিত্ব। (৩) যাহারা নানাভাবে অকাতরে অর্থ

সাহায্য করিয়া ইহাকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে, তাহাদের দোষ-ত্রুটি অবশ্যই অবহেলা করা যায়। সরকারের কৃপণ-হস্তের দানের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইলে, ইহা এত বড় অনুষ্ঠান হইতে পারিত না। বর্ত্তমানে ইহা এসিয়ার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র—ইহা সরকারী সাহায্যে সম্ভব হয় নাই; হিন্দুদের ব্যক্তিগত দানের দ্বারাই ইহার কলেবর এরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমরা মুসলমানেরা শুধু অধিকার চাই—কিন্তু সামান্য কর্ত্তব্যটুকু স্কন্ধে লইতে চাহি না। মুসলমানেরা বিশ্ববিদ্যালয়কে যখনই আক্রমণ করিবার প্রয়োজন বোধ করিবেন, তখনই যেন এই সব কথা স্মরণ থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর মুসলমানের অনেক অভিযোগ আছে, তাহা আমি অস্বীকার করিতেছি না,—তাহার পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। মুসলমানের অনুভূতিতে আঘাত না লাগে এমন সব বিষয় নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যের মধ্যে রাখা উচিত। সর্ব্বোপরি মুসলিম-যুগের যে ইতিহাস পড়ান হয়, তাহারও অনেক বিষয় ইতিহাস-সম্মত নহে। এই সব সংশোধন হওয়া দরকার। ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু বর্ত্তমানে যে ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা হইতেছে, তাহাতে এ সব বিষয়ে কোনই উপকার হইবে না—সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষেধক সাম্প্রদায়িকতা নহে। ধীরভাবে, উদারতার সহিত ইহার দোষত্রুটির সমালোচনা করা কর্ত্তব্য। "হিন্দুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়া মুসলমানকে ও মুসলমানের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধ্বংস করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে"—এরূপ উক্তি বদ্ধ পাগল ব্যতীত আর কেহই করিতে পারে না। এই সব মিথ্যা ও কল্পিত অভিযোগ তুলিয়া যে আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে, জানি না, কোথায় তাহার পরিসমাপ্তি হইবে—কিন্তু

এই বিদ্বেষ-প্রসুত আন্দোলনের ফলে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য লোপ পায়, তবে তাহাতে দেশের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের পথ সেরূপ সুগম রহিবে না, ইহা অবধারিত সত্য।

একটা প্রশ্নের উত্তর আমরা অতি দৃঢ়ভাবেই দিব—"বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্ম-কর্ত্তৃত্ব নষ্ট হইয়াও মুসলমান উহাতে কিছু সুবিধা পাক, ইহাই ভাল?—না, মুসলমানের শত অসুবিধা সত্ত্বেও ইহার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকুক—ইহাই ভাল?" আমরা বলিব, ইহার স্বাধীনতাই অব্যাহতি থাকুক,—নাই বা পাইল বর্ত্তমানে মুসলমান কোনও সুবিধা! ইহা বিশেষ দ্রষ্টব্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা একবার হস্তচ্যুত হইলে, তাহা উদ্ধার করা কঠিন হইবে—সেই পরাধীনতার চাপে সর্ব্বত্র এমন এক মানসিকতার সৃষ্টি হইবে, যাহা দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকিলে, উহা এমন এক শক্তি অর্জ্জন করিবে, যাহা দেশের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। মুসলমানের অভিযোগ আন্দোলন দ্বারা দূর হইবে, কিন্তু, তখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপর থাকিবে না পরাধীনতার ছাপ। সেই কারণে অভিযোগ-গুলি দূর হইলেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। এই কথা বুঝিবার মত সুমতি যেন মুসলমানের হয়।

———

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও মুসলমান

কিছু দিন পূর্ব্বে মান্যবর ঢাকার নবাব-সাহেব যখন বঙ্গ-সাহিত্য বিজয় করিবার জন্য আস্ফালন করিয়াছিলেন, তখনই আমাদের সন্দেহ হইয়াছিল, এই আন্দোলন এখানে শেষ হইবে না, ক্রমে ক্রমে ইহা সীমা লঙ্ঘন করিয়া অন্যত্র সংক্রামিত হইয়া পড়িবে। এখন দেখিতেছি, আমাদের এই সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নহে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে একটা অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। নবাব-সাহেবের সেই বিখ্যাত বক্তৃতার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত যে-সব ঘটনা ঘটিয়া গেল, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট অনুমিত হইবে যে, এ দেশের ভাষা, সাহিত্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে একটা বিরাট্ যড়যন্ত্র চলিতেছে। এই যড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য মুসলমান-সমাজের গতি রাজনীতি হইতে ফিরাইয়া আনিয়া এই সব বিষয়ের দিকে পরিচালিত করা। যদি কোন-না-কোন প্রকার হিন্দু-বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের সমুদয় শক্তি নিয়োজিত হয়, তবে হয়ত মুসলমান সমাজ সরকারের কার্য্যের প্রতিকূল সমালোচনা অথবা প্রগতিশীল রাজনীতি চর্চ্চা করিবার অবসর পাইবে না। আর সেই সুযোগে, একরূপ বিনাবাধায়, সগৌরবে বাংলার বুকে সাম্রাজ্যবাদের বিজয়রথ চলিতে থাকিবে, তথা-কথিত শাসন সংস্কারকে কার্য্যকরী করা সম্ভব হইবে।

হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকিলে তাহার প্রতিবাদ করিও না, অথবা কোনও রূপ প্রতিকারের চেষ্টা করিও না,—আমরা কোনও দিনই এ কথা বলিব না। বরং ইহাই বলিব যে তাহার প্রতিকারের জন্য সর্ব্বপ্রকার সঙ্গত উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রতিবাদ ও

প্রতিকারের কথাটা সম্মুখে রাখিয়া অন্য কোনও নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য যদি কোন আন্দোলন করা হয়, তবে কোনও স্বদেশপ্রাণ মুসলমান তাহাতে যোগদান করিবে না। কারণ তাহাতে মূল অভিযোগ দূর হইবে না, কিন্তু যে নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আন্দোলন হইবে, তাহাই সিদ্ধ হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, আমরা তাহাকে এই শ্রেণীর বস্তু বলিয়া মনে করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে নিরপেক্ষভাবে তাহার বিচার করা দরকার। তৎপূর্ব্বে একটা কথা বলিয়া রাখিতেছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারে এখনও যে-সব ত্রুটিবিচ্যুতি আছে, এই আন্দোলনকারীরা সে-সব বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেন নাই। সেরূপ করিলে দেশবাসীর বিশেষ উপকার হইত, বিশ্ববিদ্যালয়ও দোষমুক্ত হইতে পারিত। তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশোধনের জন্য কোনও গঠনমূলক প্রস্তাব পেশ করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র অনুরোধ জানাইয়াছেন, সরকার বাহাদুর যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে হস্তক্ষেপ করেন। এই অনুরোধই তাঁহাদের গোপন উদ্দেশ্য নগ্নমূর্ত্তিতে প্রকটিত করিয়াছে। বলিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়কে দোষ-মুক্ত করা তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য নহে, যেন-তেন-প্রকারে উহার বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন খাড়া করিয়া উহার স্বাতন্ত্র্যটুকু নষ্ট করাই হইল এই আন্দোলনের মূল অভিপ্রায়। বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত কোন বিষয়েই তাঁহাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই। চাকরি-সমস্যা অথবা ব্যবস্থাপক সভার জন্য আসন-সমস্যা এক বস্তু, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা একেবারে ভিন্ন বস্তু। এই দুই বস্তুকে একাসনে রাখিয়া একই দৃষ্টিতে দেখিলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে, বাংলা-সাহিত্যের উপর হিন্দুদের যে এত প্রভাব তাহা হিন্দুদের পক্ষ হইতে কোনরূপ ষড়যন্ত্রের ফলে নহে। তাহা নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই হইয়াছে। ঠিক সেই কথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলায় প্রযোজ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর হিন্দুদের প্রভাব যে প্রবল তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, তাহা কোনও ষড়যন্ত্র বা চক্রান্তের ফলে হয় নাই, তাহাও সাহিত্যের মত স্বাভাবিক ভাবেই হইয়াছে। প্রথম যুগ হইতেই মুসলমানদের অবহেলা, উদাসীনতা এবং প্রাচীন পন্থা ও গতানুগতিকতাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিবার জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মুসলমানরা "নির্ব্বাসিত" হইয়াছে। সেই যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত মুসলমানদের মক্তব-মাদ্রাসা ও মধ্যযুগীয় শিক্ষার প্রতি আগ্রহ একটুও কমে নাই। ইংরেজী ভাবধারা প্রচারের একমাত্র প্রতীক বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁহারা কোনওদিন স্নেহের চক্ষে দেখেন নাই। সময়ের সহিত তাল রাখিতে না পারিয়া মুসলমানেরা একটা মস্ত সুযোগ হারাইয়াছে। হিন্দুরা সে সুযোগ ত হারায় নাই, বরং তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া নিজেদের কার্য্য সিদ্ধ করিয়া লইয়াছে, এটা কি তাহাদের মস্ত বড় অপরাধ? সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর হিন্দুদের যে প্রাধান্য হইয়াছে তাহাকে উহাদের "হীন ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত" ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করা নিতান্ত অন্যায়। তাহাদের প্রাধান্য কোন চক্রান্তের ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাহা সম্ভব হইয়াছে একেবারে স্বাভাবিক ভাবে ও স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে। যখন দেশের প্রত্যেক স্তরে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সেই সময় আবার নূতন করিয়া সাম্প্রদায়িকতার অনলে ইন্ধন জোগাইয়া দেওয়া ঘোর অন্যায়। ইহাতে মুসলমানদের অগ্রগতির পথে অভিনব বাধা উপস্থিত হইবে।

রাজনীতির সাম্প্রদায়িকতাকে সাহিত্যে আমদানি করিলে সর্ব্বত্র যে কুফল হয়, মুসলমানদের বেলায়ও তাহাই হইবে। ইহাতে সত্যকারের সাহিত্য চর্চ্চায় ত ব্যাঘাত ঘটিবেই, তাছাড়া ধর্ম্মান্ধতা আসিয়া সমাজের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিকে কলুষিত করিয়া দিবে। সাহিত্য সমগ্র জগদ্বাসীর উপভোগের সামগ্রী। যদি কোথাও দেশ কাল ধর্ম্ম ও জাতির বিচার না থাকে তবে তাহা সাহিত্যজগতে। কোনও লেখক যখন স্বীয় রচনা প্রকাশিত করেন, যখন তাহা হইয়া পড়ে সারা বিশ্বের সম্পদ। বিশ্ববাসী তাহা হইতে রসাস্বাদন করিতে থাকে। তাহার ধর্ম্মভাব দ্বারা কেহই বিভ্রান্ত হয় না। রচনার নিজস্ব গুণ না থাকিলে তাহা বেশীদিন টিকে না, কিন্তু রচনার মধ্যে প্রকৃত সম্পদ থাকিলে তাহা কালজয়ী হয়। 'পিলগ্রীম্‌স প্রোগ্রেস', 'প্যারাডাইজ লষ্ট্', 'প্যারাডাইজ রিগেণ্ড', 'ইমিটেশন অব ক্রাইষ্ট' প্রভৃতি ধর্ম্মভাবমূলক অমূল্য পুস্তক পড়িয়া ভারতের কোনও হিন্দু অথবা মুসলমান, খ্রীষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন অথবা তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন, এমন কথা কেহই বলিতে পারেন না। আবার কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণের অমর গ্রন্থ পড়িয়া কেহ "শুদ্ধি" হইয়া যান নাই, অথবা হিন্দুধর্ম্মের অন্ধপূজকও হন নাই। ঠিক সেইরূপ ফেরদৌসী, হাফেজ, রুমী, ওমর খৈয়াম পড়িয়া কোনও অ-মুসলমান ইস্‌লামের শান্ত শীতল ছায়ার তলে আশ্রয় লইতে আসেন নাই। যদি কেহ ভক্ত হইয়া থাকেন, তবে সেই কবিরই; আর যদি কেহ আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, তবে সেও সেই কবির অমর অবদানের প্রতি। হিন্দুর পক্ষে ওমর খৈয়াম বা মিলটনের প্রতি, অথবা খ্রীষ্টানের পক্ষে কালিদাসের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া যদি অন্যায় না হয়, তবে মুসলমানের পক্ষেও ভিন্নধর্ম্মী কবি ও লেখকের প্রতি সেইরূপ আকৃষ্ট হওয়া কোন

মতেই অন্যায় হইবে না। রসপিপাসু পাঠক আপন আপন রুচি ও শিক্ষা অনুসারে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কবির ভক্ত হইয়া থাকেন। কাহারও নিকট শেক্স্পীয়র আদর্শ কবি, কাহারও আদর্শ শেলী, কাহারও হাফেজ, কাহারও কালিদাস, ইত্যাদি। অপর দেশীয় ও অপর সম্প্রদায়ের কবিকে নিজের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিলেই কি সে 'কাফের' হইয়া যাইবে? দাড়ি কামাইলে, গানবাজনা শুনিলে 'কাফের' হইবে এই ফতোয়া যাঁহারা দিয়া থাকেন তাঁহাদের নিকট সবই সম্ভব। কিন্তু আমরা ইংরেজী-শিক্ষিত মুসলমানদের নিকট নিবেদন জানাইতেছি, তোমাদেরও কি এই মত? এইরূপ ধর্ম্মান্ধতার দ্বারা তোমরাও কি চালিত হইবে? আমাদের মনে হয়, অন্য দেশের ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইলে, অথবা তাহার কোনও অংশ ভাল বলিয়া গ্রহণ করিলে ধর্ম্মনাশের কোনই ভয় থাকে না। সুতরাং বাংলা ভাষার বিভিন্ন লেখকের সহিত পরিচিত হইলে—এমন কি কাহারও ভক্ত হইয়া পড়িলেও—তাহাতে মুসলমানদের ভয়ের কোনই কারণ নাই। ইহাতে তাহাদের সংস্কৃতিও বিপন্ন হইবে না। বরং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাবধারার সংস্পর্শে আসিলে তাহাদের নিজস্ব সংস্কৃতি পরিপূর্ণতা লাভ করিবে।

ইংরেজী সাহিত্য অথবা অন্য কোন ইউরোপীয় সাহিত্য ভালরূপে আয়ত্ত করিতে হইলে বাইবেল ও রোম-গ্রীসের পৌরাণিক কাহিনী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। কারণ বড় বড় কবি ও সাহিত্যিকগণ এই সব কাহিনী হইতে বাছাই বাছাই উপমাগুলি নিজেদের রচনার মধ্যে এমন কৌশলে মিলাইয়া দিয়াছেন যে, সেই সব গল্প সম্বন্ধে ভালরূপ জ্ঞান না থাকিলে কেবল পাদটীকার উপর নির্ভর করিয়া সম্যক্‌রূপে রস আস্বাদন করা যায় না। অভিধানের সাহায্যে অর্থোদ্ধার করিতে গেলে একটা

কিছু মানে পাওয়া যাইবে সত্য, কিন্তু তাহাতে কবির সহিত এক হইয়া রসাস্বাদন করা মোটেই সম্ভব হইবে না। শেক্স্পীয়র, মিল্টন, এডিসন, কীটস্, শেলী, কার্লাইল, রাসকিন, টেনিসন, ব্রাউনিং প্রভৃতি কবি ও লেখকগণ তাঁহাদের রচনার মধ্যে মুক্তহস্তে বাইবেল ও পৌরাণিক উপমা ছড়াইয়া দিয়াছেন—সেই সব ভালরূপে না জানিলে কেহই তাঁহাদের রচনা পড়িয়া প্রকৃত আনন্দ পাইবে না। উদাহরণস্বরূপ, মিল্টনের "To a Virtuous Lady" নামক একটি অমূল্য সনেটের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সনেটের প্রায় প্রতি পংক্তিতে কবিবর বাইবেলের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বহু বিষয় ভরিয়া দিয়াছেন। তিনি 'প্যারাডাইজ লষ্ট', 'প্যারাডাইজ রিগেণ্ড' এবং কোমাস'-এ রোম গ্রীসের কত উপকথা প্রয়োগ করিয়াছেন। সৌন্দর্য্যের কবি কীট্স্‌কে বুঝিতে হইলে, তাঁহার 'Ode to Nightingale', এবং 'Ode on a Grecian Urn' ভালরূপে আয়ত্ত করিতে হইলে বাইবেল ও পৌরাণিক কাহিনী সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা একান্ত দরকার। বোধ হয় এই কারণে বিদ্যালয়ে পূর্ব্বে Legends of Greeee and Rome পড়ান হইত। এখন তাহা আর পড়ান হয় না। পদে পদে সংস্কৃতি-বিলোপের ভয় দেখাইলে উৎকৃষ্ট সাহিত্য হইতে জাতি চিরকালের তরে বঞ্চিত হইয়া থাকিবে।

বাংলা ভাষা ভালরূপে আয়ত্ত করিতে হইলে হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনী সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। কারণ বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকগণ অধিকাংশ হিন্দু। তাঁহারা প্রাচীন সাহিত্য ও পৌরাণিক কাহিনী হইতে, ইউরোপীয় লেখকগণের মত, বহু উপমা নিজ নিজ রচনার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই সব গল্প কাহিনী না জানিলে তাঁহাদের রচনা বুঝিতে কষ্ট হইবে। রামচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হইবার জন্য

আমরা রামায়ণ না পড়িতে পারি, কিন্তু মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' পড়িবার জন্য আমাদের রামায়ণ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। সেইরূপ 'ব্রজাঙ্গনা,' 'তিলোত্তমা,' 'বৃত্রসংহার' প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থের সহিত পরিচিত হইতে হইলে হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানা আবশ্যক।

উপস্থিত বাঙালী মুসলমাদের সাহিত্যিক উন্নতি এত কম যে, কেহ যদি মনে করে কেবলমাত্র মুস্‌লিম-লেখকের উপর নির্ভর করিয়া বাংলা শিখিব, তবে তাহাকে হতাশ হইতে হইবে। অতীব লজ্জা ও দুঃখের সহিত ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে। সুতরাং হিন্দু-সাহিত্যের উপর নির্ভর করা ব্যতীত বর্ত্তমানে অন্য পথ নাই। অতএব সেক্ষেত্রে হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনীর সহিতও পরিচিত হওয়া দরকার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'বাংলা সিলেক্‌শনে'র মধ্যে পৌরাণিক-কাহিনীপূর্ণ রচনা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, ইহা সত্য, কিন্তু তজ্জন্য কর্তৃপক্ষকে দোষ দেওয়া চলে না। কারণ সে-সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে আমরা এই অনুরোধ জানাইতেছি যে তাঁহারা যেন ভবিষ্যতে মুসলিম-সংস্কৃতির বিষয় পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবিষ্ট করেন। কারণ মুসলমানদের সম্বন্ধে হিন্দুদের কিছু কিছু জানা দরকার। পাঠ্য-পুস্তক রচনা করিবার সময় আরও দেখিতে হইবে, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণাত্মক বিষয় যেন উহাতে কিছুতেই স্থান না পায়। উহাতে এমন সব বিষয় থাকা দরকার যাহাতে এক সম্প্রদায় অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবান, সহানুভূতিশীল ও প্রীতিভাবাপন্ন হইতে পারে; একে অপরকে যেন ঘৃণা করিতে না শিখে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একদেশদর্শী সমালোচকগণ উহার যে-সব দোষত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আংশিক সত্য কিছু থাকিলেও,

তাহার অধিকাংশ বিদ্বেষমূলক, অসত্য ও প্রতিক্রিয়াশীল। বিদ্বেষ প্রচার করিয়া সমাজের কোনও অভিযোগের প্রতিকার হইবে না। যে উদ্দেশ্যে কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনকে নিন্দা করা হয়, ইহাও তাহারই বহির্বিকাশ মাত্র। মুসলমান হইয়াও এই আন্দোলনে আমাদের যোগ না দিবার কারণ এই যে, আমরা মনে করি, ইহার দ্বারা মুসলমানদের লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক। ইহাতে সমাজের মধ্যে ধর্ম্মান্ধতা আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং ভ্রান্ত পথে মুসলিম-সংস্কৃতি রক্ষা করিতে গিয়া মুসলমানদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার প্রসার হইবে না। বাংলার এক শ্রেণীর মুসলমানের 'সুদৃঢ় ও সুচিন্তিত' বিশ্বাস সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সব কথা বলা সম্ভব হইবে না, তবে একান্ত কর্ত্তব্যবোধে দু-একটা কথা বলা দরকার মনে করিতেছি।

মুসলমানদের দেহ মন ও মস্তিষ্ক বিদ্যালয়ের হিন্দুপ্রভাবিত সাহিত্য ও ইতিহাস পাঠ করিয়া আড়ষ্ট ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা মিথ্যা ও বিদ্বেষপ্রসূত ত বটেই; তাহা ছাড়া তদ্দ্বারা মুসলমানের বর্ত্তমান অধঃপতনের মূল কারণ উপলব্ধি করিবার যোগ্যতার অভাবই প্রতিপন্ন হইতেছে। হাজার হাজার মুসলমান যুবক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে লেখাপড়া শিখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাব অনেক আছে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন হিন্দু প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। এতদিন ধরিয়া হিন্দু সাহিত্য পড়িয়াও কোনও মুসলমান হিন্দু দেবদেবীর প্রতি ভক্তিমান হইয়া উঠে নাই। ভক্তি করা ত দূরের কথা, প্রত্যেক মুসলমানই মনে-প্রাণে পৌত্তলিকতাকে ঘৃণা করিয়া থাকে। হিন্দুদের পৌরাণিক দেবদেবীর কাহিনীর সহিত পরিচিত হইয়া তাহাদের সম্মুখে মাথা নত করিয়াছে এমন একটা মুসলমানও পাওয়া যাইবে না। রোমান, গ্রীক

ও বাইবেলের কাহিনী পড়িয়াও কেহ সেগুলিকে আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করে না। এগুলিকে সকলেই সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া জানে, আর সেই ভাবেই পড়িয়া থাকে। ইহার মধ্যে প্রভাব বিস্তারের কথা আদৌ উঠিতে পারে না। আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, বিশ্ববিদ্যালয়প্রবর্ত্তিত বাংলা-সাহিত্য পড়িয়া মুসলমান হিন্দুভাবাপন্ন হইবে বলিয়া যে ভয় করা হইতেছে তাহা অলীক—যুগযুগান্তর ধরিয়া পড়িলেও তাহা হইবে না। অপর ধর্ম্মের ত দূরের কথা, মুসলমানদের নিজ সমাজের মধ্যে যে-সব গালগল্প প্রচলিত আছে তাহাই তাহারা অবিশ্বাস করিতেছে; যথা, 'বাহিরা রাহেবের গল্প', 'বক্ষবিদারণকাহিনী', হজরত ইসার বিনা বাপে জন্মের কথা, এবং তাঁহার এখনও জীবিত থাকিবার কথা',—এই সব বিষয় তাহারা নানা যুক্তিতর্ক দ্বারা খণ্ডন করিতেছে, আর তাহারা অপরের পৌরাণিক কাহিনীর দ্বারা প্রভাবিত হইবে! A thing of beauty is a joy for ever'—ইহাই যদি মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়, তবে সে যেখানেই সৌন্দর্য্যের আস্বাদ পাইবে সেইখানেই যাইবে। সে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে সেই চিরবাঞ্ছিত সৌন্দর্য্যের জন্য প্রবেশ করিবে। বর্ত্তমান জগতের গতি কুসংস্কারের দিকে নয়,—সুতরাং পৌত্তলিকতা ও প্রকৃতিপূজার মোহে মানুষ অধিক দিন আকৃষ্ট থাকিবে না। কিন্তু উহার মধ্যে যদি সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাওয়া যায় তবে কেন তাহা গ্রহণ করিবে না? নিজেদের সংস্কৃতি নাশের ভয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাহিত্য অবহেলা করিলে নিজেদেরই বঞ্চিত করা হইবে।

নিজেদের কালচার, সাহিত্য ও আদর্শ ব্যতীত অপর কাহারও কিছু জানিব না, শিখিব না ও বুঝিব না, এই নীতিতে যদি সকলেই চলিতে থাকে, তবে শুধু যে জ্ঞান ও সভ্যতার আদান-প্রদান হইবে না তাহা নহে,

তাহাতে কাহারও সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্যক পরিপুষ্টও হইবে না। আজ মুসলিম কালচার বলিয়া যাহা প্রচলিত আছে তাহাতে মুসলমানদের নিজস্ব দান থাকিলেও, তাহাতে কি গ্রীসীয়, ইরাণীয় বা অন্যান্য কালচারের প্রভাব কিছুই নাই? মুসলমানদের নিজস্ব ভাবধারার সহিত নানা দেশের সভ্যতার সংমিশ্রণেই মুসলিম কালচার পরিপূর্ণ হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? আবার গ্রীক, রোমক ও আরব সভ্যতার সংস্পর্শে না আসিলে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি কখনই বর্ত্তমান আকার ধারণ করিতে পারিত না। তাহা হইলে পোপ-শাসিত মধ্যযুগের মত সমগ্র ইউরোপে আজিও 'ডার্ক এজ'-এর প্রভাব থাকিত। হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতাও নানা ভাবধারার সংস্পর্শে আসিয়া আজ বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। যে সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তি থাকেন তাঁহারা অপরের ভাবধারাকে গ্রহণ করিয়াও নিজের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইতে দেন না। অনেকে তাহা পারে না, সুতরাং তাহারা পরের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। এই কারণে কত দেশের কত কালচার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ধ্বংস হইবার ভয়ে কূপমণ্ডুকতাও ভাল নহে। কাহারও কালচার যদি বাস্তবিকই ভাল হয়, কেন তাহা গ্রহণ করিব না? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে হিন্দু-কালচার ভরিয়া দিতেছে—তাহা না-হয় মানিলাম, কিন্তু বাস্তবিকই যদি হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে সার সত্য কিছু থাকে তবে তাহা গ্রহণ করিলে কি মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য, মর্য্যাদা ও আত্মসম্মান একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইবে? চুম্বকের মত তাহাদের ভাল অংশটুকু যদি আয়ত্ত করিতে পারি, তবে তাহাতে আমাদের লাভ ব্যতীত ক্ষতি হইবে না। তাহাতে মুসলমানদের "শুদ্ধি" হইয়া যাইবার কোনও ভয় নাই।

বাল্মীকি, হোমার, কালিদাস, শেক্সপীয়র, গ্যেটে, হাফেজ, রুমী, খৈয়াম প্রভৃতি মহাকবিগণ কোনও জাতি দেশ বা সম্প্রদায়-বিশেষের নহেন—ইঁহারা সমগ্র বিশ্বের সম্পদ। ইঁহাদের ভাবধারার সহিত পরিচিত হওয়া যে-কোন পাঠকের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়। কালচার ও ধর্ম্মনাশের ভয়ে যদি কেহ এই সকল মনীষীর জ্ঞানজগতের দ্বারদেশেও আসিতে না চায় তবে তাহার মানবজন্ম ব্যর্থ, তাহা তাহার পক্ষে অশেষ দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। আমাদের মনে হয় কোনও সংস্কারমুক্ত শিক্ষাব্রতী ধর্ম্মনাশের নামে এই সব মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিতে কুণ্ঠা বোধ করিবে না। মহাকবি গ্যেটে যে কালিদাসের গুণ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ শকুন্তলা সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি। অথচ তিনি হিন্দু সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, এমন অভিযোগ তাঁহার কোন শত্রুও করিতে পারেন নাই। মহামনীষী আল-বেরুণী দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতবর্ষে থাকিয়া ভারতীয় ভাষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সন্ধানে বহু গবেষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি হিন্দু হইয়া পড়িয়াছিলেন এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। বর্ত্তমান যুগের বাঙালী-মুসলমানই বা কেন বাংলা-সাহিত্য পড়িয়া হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে? বরং আমরা মনে করি দু-দশখানা "ছহি ছোনাভান" ও "গোলেবকাওলী" পড়ার চেয়ে একখানা 'শকুন্তলা', একখানা 'মেঘদূত', একখানা 'ফাউষ্ট', একখানা 'হ্যামলেট', একখানা 'ইলিয়াড' পড়ার মূল্য অনেক বেশী। ইহাতে দেহ-মনের অবসাদ অনেকটা কাটিয়া যাইবে। একথা এই ধর্ম্মান্ধ সমাজকে কে বুঝাইবে? যাহারা এই সব অমূল্য সম্পদ হইতে সমাজের গতি ফিরাইয়া আনিয়া 'মধ্যযুগে'র আদর্শের দিকে লইয়া যাইতে চায়, তাহারা সমাজের যে কি সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহা চিন্তা করিলে দুঃখে অভিভূত হইতে হয়।

বিভিন্ন দেশের ভাবধারা ও সাহিত্যের সহিত পরিচিত হওয়ার মধ্যে যে সার্থকতা আছে, কূপমণ্ডূকতার মধ্যে তাহা নাই। মধ্যযুগের পোপ-প্রভাবিত খ্রীষ্টান ইউরোপ যেদিন রোম-গ্রীসের কালচারের সাক্ষাৎ স্পর্শ পাইল, সেই দিন হইতে তাহার সত্যকার জাগরণ আরম্ভ হইল। সেই সময় হইতে তাহার জ্ঞান প্রসারিত হইল, চিন্তাশক্তি অবারিত হইল। মানুষ শিখিল প্রত্যেক বিষয়ে সন্দেহ করিতে; এই সন্দেহ হইতে আসিল অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি—আর এই অনুসন্ধিৎসা হইতে আসিল সৃষ্টির নব নব পরিকল্পনা, কাব্য, কলা, শিল্প, জ্ঞান, বিজ্ঞান। ধর্ম্মান্ধতার জন্য মুসলমান যদি প্রতি পদে ভীত হইয়া পড়ে, সব কিছুকে পরিহার করে, নিজস্ব ব্যতীত অন্য কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করে, তবে তাহার অনুসন্ধিৎসার পথ একেবারেই রুদ্ধ হইয়া যাইবে। এই সব বিভিন্ন দেশের জ্ঞানরাশি আহরণ করিবার প্রকৃষ্ট সময় ছাত্রাবস্থায়—কেননা তৎপরে কর্ম্মজগতে প্রবেশ করিলে অবসর তাহার অল্পই থাকিবে।

সময় সময় দেখা যায়, কোন কোন জাতির এতদূর অধঃপতন হয়, মনোবৃত্তি এরূপ শোচনীয় হইয়া পড়ে যে তাহারা তাহাদের পতনের মূল কারণ নির্ণয় করিতে পারে না; তখন তাহারা যে-কোনও বিষয়ে একটু অসুবিধা ভোগ করে, মনে করে তাহাই বুঝি তাহাদের অধঃপতনের কারণ। কিন্তু কিছুকাল পরেই দেখা যায় যে, সে অসুবিধা দূর হইলেও তাহাদের অবস্থার একটুও উন্নতি হয় না। ব্যাধির মূল কারণ দূর না হইলে বাহ্যিক কতকগুলি লক্ষণ হ্রাস পাইলেই সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না। আমাদের বাঙালী-মুসলমানদের বেলায় এই কথাটা খুব খাটে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা একটু চিন্তাশীল, তাঁহারা চারি দিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এটুকু বুঝিয়াছেন যে, মুসলমানের মানসিকতা, তাহার

দেহ মন ও মস্তিষ্ক আজ অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। কিন্তু এই অধঃপতনের মূল কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া তাঁহারা মস্ত ভুল করিয়াছেন—সম্মুখে যাহাকে পাইয়াছেন তাহাকেই আক্রমণ করিয়া মনে করিতেছেন, ইহাতেই বুঝি আমাদের মুক্তি নিহিত আছে। যেখানে সিডিসন আইনের ভয় নাই, প্রেস আইনের ভয় নাই, সেইখানে নিরাপদে তাঁহাদের সমস্ত আক্রমণ গিয়া পড়িল। তাঁহাদের এই আক্রমণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাটা "ঢিল-খাওয়া পাখী"র মত হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু যদি এই ভাবে যথা-তথা আক্রমণ চালাইয়া তাঁহারা মনে করেন সমাজের কল্যাণ-সাধন করিতেছি, আর সমাজ যদি মনে করে ইহাতেই তাহাদের কল্যাণ ও মুক্তি হইবে, তবে বলিব এ সমাজের উদ্ধার হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে।

মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ নির্ণয় করিবার জন্য এ প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। সুতরাং সে-বিষয়ে আমরা উপস্থিত কোনও কথা বলিব না, কিন্তু একথা দৃঢ়ভাবে বলিব, আজ যে মুসলমানদের দেহ-মন আড়ষ্ট ও অবসন্ন হইয়াছে তাহার জন্য দায়ী হিন্দু-প্রভাবিত বাংলা-সাহিত্য নয়, অথবা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্পর্শে যাহারা কোনও দিনই আসে নাই, তাহারা কি এই আড়ষ্ট ভাব ও অবসাদ হইতে মুক্তি পাইয়াছে? আমাদের বিরাট্ 'আলেম' (পণ্ডিত) সমাজ, কোরআন আর হাদিস যাঁহাদের কণ্ঠস্থ, তাঁহাদের মানসিকতা কি বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে পাস-করা ছেলেদের অপেক্ষা একটুও উন্নত? বরং পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, ইহারা মৌলবী মৌলানা অপেক্ষা চরিত্রবলে, উন্নত মানসিকতায় ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির প্রসারে অনেক বিষয়ে উন্নত। তাহা ছাড়া মুসলমান যুবকগণের সম্বন্ধে যে আড়ষ্টতা ও অবসাদের কথা বলা

হইয়াছে, তাহা হইতে হিন্দু যুবকগণও কি মুক্তি পাইয়াছে? এদেশের শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে একটা সাধারণ অভিযোগ এই যে, ইহা 'মানুষ' তৈয়ার করে না—তৈয়ার করে কতকগুলি কেরাণী ও চাকুর্‌য়ে। এই ত্রুটিবহুল শিক্ষাপদ্ধতি যুবকগণের মধ্যে অবসাদ ও আড়ষ্ট ভাবের জন্য কতকটা দায়ী তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু ইহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত বাংলা ভাষাকে দায়ী করা নিতান্ত ভুল। কিছু দিন পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষার জন্য কোনও পুস্তক অবশ্য-পঠিতব্য করেন নাই। তখন যে-সব মুসলমান সেখান হইতে পাস করিয়াছিলেন তাঁহারা কি এই অবসাদ ও পরমুখাপেক্ষিতার দারুণ অভিশাপ হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন? দেড় শত বৎসরের পরাধীনতায় দেশের সর্ব্বত্র ও সর্ব্বস্তরে যে একটা অবসাদ, তন্দ্রা ও পরমুখাপেক্ষিতার ভাব লক্ষিত হইতেছে, মুসলমানদের মধ্যেও তাহাই দেখা যাইতেছে, আর সবগুলি একই কারণ-সম্ভূত। নিজ সম্প্রদায়ের অধঃপতন দেখিয়া অপর সম্প্রদায়কে তাহার জন্য দায়ী করিলে কেবলমাত্র সত্যের অপলাপ করা হইবে। বাংলার বাহিরে অন্যান্য দেশের মুসলমানগণ কি এই পরমুখাপেক্ষিতা ও অবসাদের মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছেন? বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের মুসলমান বুঝি একেবারে হজরত মহম্মদ যুগের আরববাসীদের মত? ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে তাহাদের মধ্যেও সেই আড়ষ্টতা ও অবসাদ! আর যাঁহারা উচ্চশিক্ষিত তাঁহারাও মধ্য-যুগকে বরণ করিয়া লইতে সম্মত নহেন। সেখানেও কি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দু-সংস্কৃতি ছড়াইতে গিয়াছে? সর্ব্বশেষে ভারতের বাহিরে গেলে কি দেখা যাইবে? খলিফা-প্রভাবাধীন তুরস্কের অবস্থার সহিত আজিকার তুরস্কের তুলনা করিলেই মুসলমানদের অধঃপতনের

মূলীভূত কারণ স্পষ্ট বুঝা যাইবে। তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি দেশ আজ তথাকথিত মুস্‌লিম-সংস্কৃতি ও মুসলিম-সংহতির মোহে নিজেদের সর্ব্বনাশ-সাধন করিতে সম্মত নহে। তাহারা বিশ্বের যেখানে যাহা ভাল আছে তাহাই সংগ্রহ করিয়া নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিতে চায়। বাংলার মুসলমানদিগকেও আজ সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। মুসলমানদের অধঃপতনের ও শোচনীয় পরমুখাপেক্ষিতার মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে নিজেদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে—সমাজের অভ্যন্তরে গলদ থাকিলে, অপরকে তাহার জন্য দায়ী করিলে কোন দিনই নিজের সংশোধন হইবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া অথবা ইহাকে সরকারের করতলগত করিয়া দিতে সাহায্য করিয়া মুসলমানদের কোন লাভ হইবে না। আমরা ইহা বেশ জানি, সমাজের উপর অপ্রতিহতভাবে নেতৃত্ব চালাইতে গেলে এক-আধটু হিন্দুবিরোধী আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত না থাকিলে চলিবে না। কিন্তু তাহার জন্য ত রাজনীতির প্রশস্ত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। বাঁটোয়ারা, চাকরি-সমস্যা, বাজনা-সমস্যা—এই সবই ত হিন্দুবিরোধী কার্য্যের বেশ উত্তম ও ভাইটামিন-যুক্ত খোরাক জোগাইতে থাকিবে। এসব ছাড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর শ্যেনদৃষ্টিপাত করিবার কি দরকার? যাহাকে তাহাকে দিয়া, কতকটা বেনামী ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে গরম-গরম ভাষায় দু-একটা প্রবন্ধ লিখাইয়া লইলেই সব কাজ ফরসা হইবে না। আমাদের অভাব মোচন করিতে হইলে তাহার অন্য উপায় আছে। শিক্ষা-সংস্কার করিতে হইলে, বর্ত্তমানে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু হইতেছে অজস্র টাকার। সমাজের নিকট হইতে এই অর্থ আদায় করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করুন, মুসলিম-

সংস্কৃতির উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন বিভাগ খুলিয়া দিন, কয়েক লক্ষ টাকা দিয়া উচ্চ আলোচনার (higher studies) জন্য কোরআন ক্লাস, হাদিস ক্লাস খুলিয়া দিন, ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন বিভাগ পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দিন। আর এই সব ইসলামী বিভাগে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যে তাহাতে কোন অমুসলমান পড়িতে আসিলে সে যেন পড়ার সম্যক্ সুযোগ ও বৃত্তি পাইতে পারে। এই সব করিলে অল্প দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র হইবে, অথচ তাহা মক্তব-মাদ্রাসার মত মধ্যযুগীয় আদর্শের প্রতীক হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয়কে সংশোধন করিবার ইহাই হইল প্রকৃত পন্থা। কিন্তু তাহা না করিয়া পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া খাইতে গেলে সে কেন তাহা সহ্য করিবে? বাহিরের লোকের আক্রমণে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে আমাদের কিছুই কাজ হইবে না। কিন্তু উহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া অর্থসাহায্য দ্বারা উহাকে পুষ্ট করিলে উহার স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকিবে, অথচ প্রকৃত কাজ হইবে। আমরা এ-বিষয়ে প্রত্যেক মুসলমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মুসলমানের অভিযোগ ও তাহার স্বরূপ

কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ ঘটনা বা বিষয়কে উপলক্ষ করিয়া সচরাচর সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্রের বিশেষ সংখ্যা বাহির হইয়া থাকে। সেই ঘটনা বা বিষয়কে নানা ভাবে আলোচনা করিয়া পাঠকদের সম্মুখে তাহার সব খবর প্রকাশ করা হইল এই শ্রেণীর বিশেষ সংখ্যার প্রধান উদ্দেশ্য। কয়েকজন বিখ্যাত জননেতার মৃত্যু উপলক্ষে কয়েকটি পত্রিকাই বিশেষ সংখ্যা বাহির করিয়াছিল। কংগ্রেসের বিগত জুবিলি উপলক্ষেও কয়েকটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা বাহির করিয়াছিল। আমরা যখন শুনিলাম "মাসিক মোহাম্মদী" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে একটা বিশেষ সংখ্যা বাহির করিতেছেন, তখন মনে করিয়াছিলাম, উহা এই ধরণেরই কিছু হইবে। বিশেষ সংখ্যার কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য থাকে, যথা,—কোনও বিষয়ের ক্রম বিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস, তাহার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার বিবরণ, তাহার গৌরবময় মহিমার পরিচয় প্রদান, তাহার বর্ত্তমান ত্রুটি বিচ্যুতির কারণ ও সংশোধনের উপায়,—ইত্যাদি ইত্যাদি। কেবল তাহাকে হেয় করিবার জন্য বিশেষ সংখ্যা বাহির করা সাংবাদিকের নীতির বিরোধী। কিন্তু মোহাম্মদী পাঠ করিয়া আমরা শুধু হতাস হই নাই, মর্ম্মাহত হইয়াছি। এই পত্রিকার "বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা" পড়িয়া মনে হয়, যেন কোন অপ্রকাশ্য কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর "মোহাম্মদীর" কর্তৃপক্ষের একটা আক্রোশ ছিল,

তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহারা এইভাবে এই বিশেষ সংখ্যা বাহির করিয়াছেন। ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, ইহার আভ্যন্তরীণ নানা শাখা-প্রশাখার কোন বিবরণই নাই, ইহার প্রতি কোনও সহানুভূতির আভাস নাই, ইহার আয় ব্যয়ের সমালোচনা নাই, ইহার সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে এমন কোন আলোচনা নাই, যাহা পাঠ করিলে পাঠক সমাজ বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারে।—আছে কেবল মনের আক্রোশ মিটাইবার প্রয়াস, একতরফা গালাগালি—আর তাহা কেবল একটা বিষয় লইয়া—যেন উহা ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আর কিছুই নাই। সুতরাং ইহাকে আমরা কিছুতেই বিশেষ সংখ্যা বলিতে পারি না—ইহা বিদ্বেষপূর্ণ আক্রমণাত্মক একটা প্রোপাগাণ্ডা।

এই প্রবন্ধের লেখক একজন মুসলমান; সুতরাং মুসলমানের সত্যিকারের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে কখনই অচেতন থাকিতে পারি না; বরং অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত তাহা মোচনের চেষ্টা করিতে থাকিব। কিন্তু অভাব অভিযোগের নামে যদি কেহ অন্য কোন উদ্দেশ্য-সাধনের চেষ্টা করে, তবে আমরা তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারি না। মোহাম্মদীর "বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা" পড়িয়া আমাদের স্থির ধারণা হইয়াছে যে তাহাতে আমাদের সত্যিকারের কোন অভাব মোচনের চেষ্টা করা হয় নাই—ইহার প্রধান উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মকর্তৃত্ব নষ্ট করা, মুসলমানের সাহিত্যিক মনোবৃত্তিকে আড়ষ্ট করা, ও প্রগতিশীল মুসলমান সমাজের স্বাধীন চিন্তার ক্রমবিকাশের পথে বিঘ্ন উৎপাদন করা। "মোহাম্মদীর" পরিচালকবর্গ প্রায় সকলেই মৌলবী, মৌলানা, প্রাচীনপন্থী এবং শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ে মধ্যযুগীয় আদর্শে আস্থাবান। তাঁহাদের নিজেদের

আদর্শে মুসলমান বালকগণ গড়িয়া উঠিতেছে না বলিয়া তাঁহারা বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়কে আক্রমণ করিয়া মনের ঝাল মিটাইতেছেন। ইঁহাদেরই সাক্ষাৎ পূর্ব্বপুরুষগণ ইংরাজি শিখিলে কাফের হওয়ার ফতোয়া জাহির করিয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল কাফের বলিলে আর চলিবে না, বা কেহ পরওয়া করিবে না। তাই তাঁহাদেরই উত্তরাধিকারী স্বরূপ এই সব নবীন মৌলানাগণ অন্যভাবে মুসলিম কৃষ্টির নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আক্রমণ করিয়া বসিয়াছেন। উভয় দলের উদ্দেশ্য এক—মুসলমানকে বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি হইতে দূরে সরাইয়া রাখা যেন তাহাদের মধ্য হইতে স্বাধীন চিন্তা লোপ পায়, যেন ইংরাজি শিখিয়াও মুসলমান যুবকগণ কেবলমাত্র পাদ্রী ও মোল্লা শ্রেণীতে পরিণত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়কে আক্রমণ করিয়া উহার ব্যাপারে সরকারকে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ জানাইয়া "মোহাম্মদী" তাঁহাদের গোপন উদ্দেশ্যটা কতকটা খোলাখুলি ভাবেই প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। আত্মকর্ত্তৃত্বপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের এই শ্রেণীর অভাব অভিযোগ মিটাইতে সমর্থ নহে, সুতরাং সরকার যেন উহাকে করতলগত করিয়া তাঁহাদের অভিযোগের কারণ দূর করেন, এই প্রকার আবেদনের সুর "মোহাম্মদীতে" প্রকট। কিন্তু সমগ্র পত্রিকাটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে এমন কোন ত্রুটি বিচ্যুতির উল্লেখ নাই, যাহার জন্য সরকার বাহাদুর আইনতঃ ইহার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। যে বিষয়ে সরকারের কোন অধিকার নাই, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে বলার কোনই সার্থকতা নাই। ইহা যে "মোহাম্মদী" জানেন না তাহা নহে,—কিন্তু এই আক্রমণ হইতে নানাপ্রকার বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়া যদি সাম্প্রদায়িকতার অনল বাড়িয়া যায়, দেশময় তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি সমাজের

মনে একটা বিতৃষ্ণা জাগিয়া যায়, তবে ত মোল্লা শ্রেণীর নেতাদের ষোল আনা লাভ। তাহার ফলে হয় ত তাঁহারা সমাজকে মক্তব-মাদ্রাসার দিকে আগ্রহান্বিত করিতে পারিবেন। আমাদের মনে হয়, এই আশায় "বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা" বাহির করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে অন্য কোন উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাইলাম না।

সরকারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে বলা হইয়াছে, এই প্রসঙ্গে পরলোকগত সার সৈয়দ আহমদের কথা মনে পড়িল। এই মহা মনীষী ব্যক্তি অনেক বিষয়ে সরকারের পক্ষপাতী ছিলেন; এবং ভারতের বুকে ব্রিটিশ-প্রভুত্বের স্থায়িত্বের জন্য অনেক কিছু করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও শিক্ষা ব্যাপারে সরকারী হস্তক্ষেপ একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি বরাবরই বিদ্যা নিকেতন হইতে গবর্ণমেণ্টের সংস্রব বর্জ্জন করিবার অভিমত প্রকাশ করিতেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সার সৈয়দ আহমদ শিক্ষা সম্বন্ধে একটা স্কীম গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করেন, ইহাতে তিনি পরিষ্কার ভাবে বলেন:—"আমরা এমন এক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চাই যাহা গবর্ণমেণ্ট তত্ত্বাবধান বা প্রভাবশূন্য হইবে।" তৎপরে ১৮৮২ সালে যে শিক্ষা কমিশন বসিয়াছিল তাহাতে সাক্ষ্য দিতে গিয়া তিনি স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন, "আমার ব্যক্তিগত মত ও আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা এই যে, গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিভাগটি সম্পূর্ণরূপে দেশীয় লোকের হস্তে ন্যস্ত করিবেন ও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে কোনও মতেই উহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না।" বহু পূর্ব্বে মনীষী সার সৈয়দ আহমদ যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, আজ "মোহাম্মদীর" কর্ত্তৃপক্ষ তাহার সার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিলেন না; তাঁহারা আজ শিক্ষা নিকেতনকে সরকারের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য এত লালায়িত হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের জানিয়া রাখা

উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারী কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে মুসলমানের বিশেষ লাভ হইবে না। সেইজন্য আমরা "মোহাম্মদীর" সহিত একমত নহি—বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আমাদের শত অভিযোগ থাকিলেও কখনও উহার স্বাধীনতানাশ সমর্থন করিব না।

"মোহাম্মদী" বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে যে সব অভিযোগ করিয়াছেন সে বিষয়ে একাধিকবার আলোচনা করিয়াছি। আমাদের মনে হয় মুসলমানের কৃষ্টি, কলাপ ধ্বংস করিবার অভিলাষকে সামনে রাখিয়া পাঠ্য বিষয় নির্দ্ধারিত হয় নাই। সেরূপ উদ্দেশ্য থাকিলে তাহার জন্য অন্য উপায় ছিল। পাঠ্য পুস্তকের নির্ব্বাচক মণ্ডলীর মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা অধিক বলিয়া হিন্দুর কৃষ্টির প্রতি তাঁহাদের একটুকু অধিক আগ্রহ থাকা অসম্ভব নহে। বোধ হয় সেইজন্য হিন্দু সভ্যতার মহিমার বিষয় তাহাতে যে পরিমাণ স্থান পাইয়াছে মুসলমানের বিষয় সেরূপ স্থান পায় নাই। কিন্তু তজ্জন্য একথা মনে করা নিতান্ত ভুল হইবে যে, মুসলমান সভ্যতাকে হেয় করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ষড়যন্ত্র করিয়াছে। আমরা যখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান চাই, তখন পাঠ্য পুস্তকে মুসলমান কৃষ্টি, কলার বিষয় থাকা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে অভিহিত হইতে অনুরোধ করি।

বহুদিন হইতে বাঙ্গলা দেশের হিন্দুরা সাহিত্য চর্চ্চা করিতেছেন বলিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য অনেকটা হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শুধু বাঙ্গলা সাহিত্যের বেলায় একথা উঠে কেন? প্রত্যেক দেশের সাহিত্য সেই দেশের লেখকের ধর্ম্ম, আচার সংস্কৃতি প্রভৃতির ছাপ অনপনোদনীয়-ভাবে পড়িয়াছে। এইরূপ ছাপ পড়িতে বাধ্য নতুবা তাহা সাহিত্যই হইতে পারে না। আপনার ভাব হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেহই

লিখিতে পারে না। সেক্সপীয়ার, কীটস্ প্রভৃতিকে অনেকে Impersonal লেখক বলিয়া থাকেন। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে তাঁহারাও স্থানে স্থানে নিজেদেরকে বেমালুম লুকাইয়া রাখিতে পারেন নাই। কোন উচ্চশ্রেণীর লেখক কেবল অপরের মন যোগাইয়া লিখিতে পারেন না। কৃত্রিমতার দূষিত বায়ুতে তাঁহাদের প্রতিভা আড়ষ্ট হইয়া পড়িবে। লেখককে লিখিতে হইবে তাঁহার নিজের খেয়াল অনুসারে, তাঁহার নিজের ভঙ্গীতে তাঁহার নিজের চিন্তিত বিষয়। তাহাতে কোন ধর্ম্মের ছাপ পড়িয়াছে কিনা—সে ধর্ম্ম পৌত্তলিক হউক অথবা একত্ববাদী হউক—তাহা দেখিলে চলিবে না, শুধু দেখিতে হইবে তাহা প্রকৃত "সাহিত্য" হইয়াছে কি না। যদি তাহা প্রকৃত সাহিত্য হয় তবে তাহা আগ্রহের সহিত পড়িতে হইবে অন্যথায় তাহা পরিত্যজ্য। রবীন্দ্রনাথের পূজারিণী, উর্ব্বশী এই শ্রেণীর কবিতা, দীনেশচন্দ্রের বেহুলা এই শ্রেণীর রচনা, মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ এই শ্রেণীর অমূল্য পুস্তক যাহা বাঙ্গালা ভাষার রসপিপাসু প্রত্যেকে আগ্রহের সহিত পড়িবে ও আনন্দ পাইবে। ইহার মধ্যে কাহার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, আচার ও সভ্যতা নাশের কথা আদৌ উঠিতে পারে না। বাঙ্গালা সাহিত্য হিন্দু প্রভাবিত বলিয়া তাহা বর্জ্জন করিলে চলিবেনা। তাহার সারাংশগুলি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। সাহিত্য-পাঠকের দৃষ্টি সব সময় সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে থাকা চাই, সেখানে কোন সম্প্রদায় নাই, দলগত ঈর্ষা নাই, আছে শুধু সাহিত্যরসিকের জন্য অনন্ত অমৃত।

এদেশে হিন্দু মুসলমানকে চিরকালই পাশাপাশি ভাবে বাস করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ভালবাসা ও সৌহৃদ্য যেমন দরকার, ভাবের আদান প্রদানও তেমনি দরকার। এই আদান প্রদান সাহিত্যের মধ্য

দিয়া যত সহজে হইবে, অন্তভাবে তাহা হইবে না। হিন্দু যদি প্রতিজ্ঞা করে মুসলমানের সাহিত্য পড়িব না, আর মুসলমানও যদি সেইরূপ ধনুক-ভাঙ্গা পণ করে, তবে মনের ও ভাবের আদান ত হইবেই না, বরং পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার ভাব বৃদ্ধি পাইবে। অতএব যাহাতে এই প্রকার ভাবের বিনিময় সম্ভব হয় তাহারই ব্যবস্থা দরকার। একটা কথা আমাদের নেতাদের মনে প্রায়ই উঠিয়া থাকে যে, পৌত্তলিকতা ভাবাপন্ন হিন্দুদের সাহিত্য পড়িলে মুসলমানও পৌত্তলিক হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু এ ধারণা অলীক। প্রাচীন যুগে প্রাথমিক মুসলমানগণ আগ্রহের সহিত গ্রীক সাহিত্য আলোচনা করিয়াছিলেন। গ্রীক ভাষার বহু গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। এবং তাহা আরবের ও স্পেনের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পঠিত হইত। কিন্তু ইস্‌লামের কৃষ্টিকলা ও সংস্কৃতিকে পরিহার করিয়া কেহই গ্রীক ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, অথবা হাবভাব আচার ব্যাপারে কেহই গ্রীক হইয়া পড়েন নাই, বরং তাঁহারা ইস্‌লামের বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখিয়া গ্রীক সভ্যতার সারাংশটুকুই গ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টান ভাবাপন্ন ইংরাজি সাহিত্যে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া কোনও মুসলমান খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। খৃষ্টান মিশনারীগণ বহু যুগ হইতে তাঁহাদের স্কুল কলেজে নানাভাবে খৃষ্টানধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিয়া আসিতেছেন, সুকুমারমতি ছাত্রদের মধ্যে বাইবেল প্রচার করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কেবল মাত্র তজ্জন্য কেহই খৃষ্টান হইয়া পড়ে নাই। যাহারা খৃষ্টান হইয়াছে তাহারা অন্যবিধ কারণেই হইয়াছে। এ দেশের মুসলমানগণও বহুকাল হইতে হিন্দু সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্টভাবে পরিচিত। কিন্তু তজ্জন্য মুসলমানগণ হিন্দুভাবাপন্ন হয় নাই।—মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু প্রভাব যে কিছুই নাই, তাহা বলি না, বরং অনেক কিছু আছে। কিন্তু

তাহা কেবলমাত্র হিন্দু সাহিত্যের কারণে নয়। দুইটি প্রধান কারণে মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু প্রভাব প্রবেশ করিয়াছে। প্রথমতঃ যাহারা হিন্দু হইতে মুসলমান হইয়াছে তাহারা তাহাদের পরিত্যক্ত ধর্ম্মের প্রভাব একেবারেই পরিহার করিতে পারে নাই। এই নবদীক্ষিত মুসলমানগণ নানাভাবে হয়ত অজ্ঞাতসারে আরব রক্তের মুসলমানের মধ্যে নিজেদের আদিম ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বহুযুগ হইতে পাশা-পাশি একই সঙ্গে একই শাসনাধীনে বাস করিয়া একে অপরকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। সেই জন্য হিন্দুদের মধ্যেও মুসলমানী প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মুসলমানের উপর হিন্দু সভ্যতার এই প্রভাব বিস্তারের মূলীভূত কারণটাকে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের সহিত জড়িত করা যায়, তবে তাহাতে সত্যের অপলাপ হইবে। বাঙ্গলাদেশের বাহিরে উর্দ্দুভাষী মুসলমানদের মধ্যেও হিন্দু প্রভাব কম নহে। সে দেশের জন্য "মোহাম্মদী" কি কৈফিয়ৎ দিবেন? সেই জন্য আমরা মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ সকল পাঠ্যপুস্তকের কারণেই যে আজ মুসলমান উন্নতি করিতে পারিতেছে না বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহার মূলে কোন সত্য তথ্য নাই। অন্যবিধ কারণে মুসলমানের দ্রুত উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব হইবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গলার হিন্দু মুসলমানের গৌরবের সামগ্রী। ইহার গৌরবে জাতির গৌরব, ইহার পতনে জাতির কলঙ্ক। যদি ইহার কোন দোষ ত্রুটি থাকে তবে সমগ্র জাতিকে সমবেতভাবে তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক কারণে উহাকে আক্রমণ করিলে কাহারও কল্যাণ হইবে না—এই দুর্ব্বার আক্রমণ হয়ত

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য এবং অস্তিত্বকে পর্য্যন্ত বিপদাপন্ন করিয়া তুলিতে পারে। উহার সমালোচনা করা দোষাবহ নহে, কিন্তু বিদ্বেষবশে উহার বিরুদ্ধে যাহা করা হয় তাহাই অন্যায় ও সীমাবহির্ভূত কাজ। আশা করি, সাধারণ মুসলমান "মোহাম্মদীর" আক্রমণ দ্বারা বিভ্রান্ত হইবেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িবেন না।

মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা

বর্ত্তমান যুগে যতগুলি সমস্যা অমীমাংসিত অবস্থায় পতিত রহিয়া এখনও তর্ক ও বাদানুবাদের স্তর উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই, তন্মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান হইতেছে—বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা। এই শিক্ষা-সমস্যা লইয়া পত্রিকায় ও মঞ্চে কত আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন সমাধান হয় নাই। সার্ব্বজনীনভাবে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার যে বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য, সে-বিষয় কাহারও মতভেদ নাই। কিন্তু কি উপায়ে দেশ-মধ্যে সার্ব্বজনীন ভাবে শিক্ষাবিস্তার হইতে পারে, তাহা লইয়া যত গণ্ডগোল ও তর্কবিতর্ক!

মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যার কি আর সমাধান হইতে পারে? এখন পর্য্যন্ত অবিসম্বাদিত ভাবে ইহাই ঠিক হইল না যে, বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃ-ভাষা কি হওয়া উচিত। যে-দেশে বাস করিয়া, যে দেশের আব হাওয়ার মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া মুসলমান বালক বাল্যকাল হইতেই সেই দেশের ভাষায় কথা কহিতে শিখিয়াছে, লেখা-পড়া না শিখাইলে সেই ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষার একটি অক্ষরও বুঝিতে পারে না, বঙ্গদেশ প্রচলিত সেই বঙ্গ-ভাষা তাহার মাতৃ-ভাষা ও শিক্ষার বাহন হইবে কি না, শিক্ষা-সমস্যার প্রারম্ভেই যখন এই কথাটাই প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে, তখন শিক্ষা সম্বন্ধে কোন উচ্চ কথা ভাবিবারই অবসর থাকে না। সর্ব্বপ্রথম ভাষার সমস্যার মীমাংসা হওয়া উচিত!

বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃ-ভাষা, বাঙ্গলা ছাড়া অন্য কোন ভাষাই যে হইতে পারে না, তাহা বুঝাইবার জন্য প্রমাণের কোন প্রয়োজন নাই।

আফগানিস্তানের নাশ্‌পাতি বৃক্ষ বাঙ্গলার মাটিতে রোপন করিলে ভাল ফলের আশা করা যেরূপ চরম মূর্খতা, পশ্চিম-দেশের মাতৃ-ভাষা উর্দ্দুকে বাঙ্গলার মধ্যে প্রচলিত করিয়া, একদল নেতা সেইরূপ অর্ব্বাচীনতার পরিচয় দিতেছেন। চীনাম্যান চীনভাষায়, ইংলিসম্যান ইংরাজী ভাষায়, আরবের লোক আরবী ভাষার মধ্যবর্ত্তীতায় লেখা-পড়া শিখিবে, তাহারা স্ব-স্ব মাতৃভাষাকে ভালরূপে আয়ত্ত করিয়া তাহারই মধ্যবর্ত্তিতায় ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণে মনোনিবেশ করিবে, আর যত ব্যতিক্রম কি কেবল বঙ্গীয় মুসলমানদের বেলায় হইবে? তাহারাই কি কেবল, জন্মাবধি যে ভাষা শিখিয়া আসিতেছে, সেই স্বাভাবিক ভাষা পরিত্যাগ করিয়া, বিদেশ হইতে আমদানী উর্দ্দুকেই মাতৃ-ভাষারূপে গ্রহণ করিবে? তাহারা কী এমন পাপকার্য্য করিয়াছে যে, তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য একেবারে মাতৃ-ভাষাকেই বিসর্জ্জন দিয়া ভিন্ন দেশের ভাষাকে গ্রহণ করিবে?

মুসলমানের প্রতিবেশী হিন্দুদের কিন্তু ভাষা সমস্যা লইয়া কোনও রূপ বাক্‌-বিতণ্ডা নাই। তাহারা বাঙ্গলাকে মাতৃভাষা রূপে গ্রহণ করিয়া অনেক দিন হইতে বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাষা-সমস্যা লইয়া হিন্দুদের কোন তর্ক-বিতর্ক নাই। তাহারা এখন নিশ্চিন্ত হইয়া বঙ্গ-ভাষার উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু মুসলমান, "যে তিমিরে সেই তিমিরে" আজও পড়িয়া রহিল।

মুসলমানের মাতৃভাষা কি হওয়া উচিত, ইহার যখন কোনও মীমাংসা হইল না, তখন আমাদের একদল সমাজহিতৈষী লোক ফৎওয়া দিলেন যে, তাহা হইলে প্রয়োজনীয় সব ভাষাই প্রত্যেককে কিছু কিছু করিয়া শিখিতে হইবে। ইহার ফলে এই দাঁড়াইল যে, কোমলমতি মুসলমান বালকের উপর উর্দ্দু, ফারসী, আরবী, ইংরাজী ও বাঙ্গলার বোঝা একসঙ্গে চাপান হইল।

এ-বিষয়ে হিন্দুদের সহিত আমাদের তুলনা করিলে উভয় জাতির শিক্ষা প্রণালীর পার্থক্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়িবে। হাতে খড়ি দিয়া হিন্দু-বালক শেখে মাত্র একটি ভাষা, আর সেটাকে সে আয়ত্ত করে খুব ভাল করিয়া। বাঙ্গালা ভাষায় একটু অগ্রসর হইলে পর, সে ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করে এবং সর্ব্বশেষে ৫ম শ্রেণী বা ৪র্থ শ্রেণী হইতে সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করে। প্রথমেই মাতৃ-ভাষা শেখে বলিয়া গোড়ায় তাহার ভিত্তি হয় খুব দৃঢ়; বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনোবৃত্তির বিকাশ হইতে থাকে। পড়িতে পারিলেই যে-ভাষা হৃদয়ঙ্গম হয়, সেই সহজ ও স্বাভাবিক ভাষাকে অবলম্বন করিয়া ভাষার প্রথম-সূত্রটি সেই কোমল বালকটি ধরিয়া ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে পঠিত বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম হয় বলিয়া তাহার মনের আঁধার ক্রমে ক্রমে দূর হইতে থাকে। সুতরাং সে সুশিক্ষার প্রভাব অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারে। মাতৃ-ভাষায় একটু জ্ঞান লাভ করার পর ইংরাজী, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিশুর পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া পড়ে। কিন্তু বঙ্গীয় মুসলমান সচরাচর ঠিক উল্টা পথ অবলম্বন করে। প্রায় অধিকাংশ মুসলমান বালকের পাঠ্যের প্রথম অবস্থায়, বাঙ্গলা ভাষার অক্ষরের সহিতও পরিচয় হয় না। হাতে 'তোক্তি' (বা খড়ি, উহা আরবীতে হয়) দেওয়ার পরই তাহাকে আরম্ভ করিতে হয়, আরবী 'কায়দা বোগদাদী'। কোর্-আনের কয়েক পাতা পড়িয়া, তাহাকে পড়িতে হয় ফারসী ও উর্দ্দু। উর্দ্দু ও ফারসীর মধ্যে স্থানে স্থানে অগ্র-পশ্চাতের তারতম্য আছে। এইরূপে ৬।৭ বৎসর আরবী, ফারসী ও উর্দ্দুর অগাধ সমুদ্রে সন্তরণ করিয়া মুসলমান বালক বাঙ্গলা ভাষার মুখ দেখিতে পায়। বাঙ্গলা ভাষায় একটু অগ্রসর হইতে না হইতেই রাজ-ভাষা ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করে। এইরূপে ৮।৯ বৎসরের এক কোমল বালকের উপর একটা দুইটা নয়,

৪।৫টা ভাষার বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয়! অনেকেই এই ভার সহ্য করিতে পারে না বলিয়া লেখা-পড়া আরম্ভ করার কিছুদিন পরেই ছাড়িয়া দেয়। আর যাহারা এই উৎকট ভাষা-সংগ্রামে কোনও রূপে আত্ম-রক্ষা করিতে পারে, তাহাদের স্বাস্থ্য ও মানসিক শক্তি এরূপ ভাবে নষ্ট হইয়া পড়ে যে, চিরটা কাল তাহার সেই জের সামলাইতে চলিয়া যায়। ৪।৫টা ভাষার এই দুর্ভেদ্য গোলক ধাঁধাঁয় পড়িয়া কত মুসলমান বালকের ভবিষ্যৎ যে নষ্ট হইয়াছে, কত প্রতিভাবান বালকের অতুলন মেধা-শক্তি যে অকালে নষ্ট হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। একটি মুসলমান বালক ও একটি হিন্দু বালক একই সময় বিভিন্ন শিক্ষকের অধীনে লেখা-পড়া আরম্ভ করিলে দেখা গিয়াছে যে, হিন্দু বালক যখন ৩য় বা ২য় শ্রেণীতে পড়িতে থাকে, তখন সেই মুসলমান বালকটি সবেমাত্র আরবী-ফারসীর মোহ কাটাইয়া বাঙ্গলা পড়িতে আরম্ভ করে। যখন হিন্দু বালকটি বি-এ, এম-এ, পাশ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখন সেই মুসলমান বালকটি কোনও রূপে কষ্টে-সৃষ্টে প্রবেশিকার সীমানায় আসিয়া হাঁপাইয়া পড়ে; আর যেন অগ্রসর হইতে পারে না। এই ভাবে মুসলমান যদি "Jack of all trade, master of none" হইতে চায়, তাহা হইলে সে কস্মিনকালেও হিন্দুর সহিত সমান ভাবে অগ্রসর হইতে পারিবে না। ইহার কুফল বুঝিতে পারিয়া কেহ কেহ পূর্ব্ব পন্থা পরিত্যাগ করিতেছেন, কিন্তু অনেকের এখনও আরবী ফারসীর মোহ কাটে নাই। আমরা অনেক অভিভাবককে বলিতে শুনিয়াছি যে, হিন্দু ছেলেরা মুসলমান ছেলেদের অপেক্ষা অধিক মেধাবী ও প্রতিভাশালী। এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু মুসলমান ছেলেদের মেধা-শক্তি নষ্টের জন্য আমাদের অভিভাবকগণও কম দায়ী নহেন। আমরা সুকুমার বাল্যাবস্থায় ছেলেদের প্রতিভা ও

মেধাশক্তিকে অসংখ্য ভাষার চাপে নষ্ট করিয়া থাকি বলিয়াই, আমাদের ছেলেরা উত্তরকালে প্রতিভা দেখাইতে পারে না। শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল অবৈজ্ঞানিক ও অকর্ম্মণ্য প্রথা আমাদের সমাজের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহার সংশোধন না করিলে শিক্ষা-সমস্যার কোনই মীমাংসা হইবে না।

যাঁহারা বাঙ্গালা না শিখিয়া, কেবল আরবী ও ফারসীর উপর ঝোঁক দিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা সমাজের বিশেষ কোন কল্যাণ হয় নাই। বাঙ্গালার মুসলমান সমাজ তাহাদের আলেম-ফাজেলদের নিকট হইতে অনেক আশা করিয়াছিল, এবং আলেম-সমাজও হয়ত মুসলমানদের জন্য অনেক কিছু করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সমাজ ও আলেমদের মধ্যে মাতৃ-ভাষার তারতম্য থাকায়, কাহারও আশা পূরণ হয় নাই। কেবলমাত্র আরবী-ফারসী অভিজ্ঞ আলেমদের দ্বারা দেশে উৎকট ধর্ম্মান্ধতা বাড়িবে, সমাজের হিতকরী কার্য্য হইবে না। বাঙ্গালা না জানার কারণে এই আলেমদের সহিত সাধারণ লোকের সত্যিকারের যোগ কোন দিন হয় নাই। আলেমরা বাঙ্গলা না শিখিলে এ ব্যবধান কোনও দিন দূর হইবে না। "গৌরবান্বিত" মাদ্রাসা সমূহের উচ্চাসন হইতে তাঁহাদিগকে বাঙ্গলার নিম্নভূমিতে নামিয়া আসিতে হইবে। বাঙ্গালার অধিবাসীদের সহিত বাঙ্গলা ভাষার মধ্যবর্ত্তিতায়ই পরিচয় করিতে হইবে। তজ্জন্য বাঙ্গলা ভাষায় পুস্তকাদি লিখিতে হইবে এবং শিক্ষার মধ্যে বাঙ্গলার স্থান সর্ব্বোচ্চে প্রদান করিতে হইবে।

পৃথিবীর কোন শুভ কার্য্যেই আপনা হইতে 'গায়ে এসে পড়া' মোড়লের অভাব হয় না। বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যার এই দুর্দ্দিনে সেই রকম এক শ্রেণীর 'আপকে-ওয়াস্তে' মোড়লের অভাব হইল না। তাঁহারা ভয় দেখাইয়া গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন যে, শিক্ষার মধ্যে উর্দ্দুর

প্রাধান্য না হইলে মুসলমান রসাতলে যাইবে ; সুতরাং তাঁহাদের নির্দ্দেশমত বাঙ্গালী মুসলমানের জন্য উর্দ্দুকে মাতৃ ভাষা রূপে চালাইয়া দিবার জন্য তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। এখনও ইহার জের মিটে নাই। কলিকাতা হইতেছে এই শ্রেণীর নেতৃবর্গের কর্ম্ম-ভূমি। আর ইহাদের অধিকাংশের মাতৃভাষাই উর্দ্দু। এই সকল নেতাদের সম্বন্ধে অধিক কথা না বলাই ভাল। ইঁহারা জীবনে কখনও বঙ্গদেশের পল্লীতে পদার্পণ করেন নাই। পল্লীবাসী মুসলমানের রীতি-নীতি, আচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে কোনই খবর রাখেন না। কলিকাতার বিদ্যুদ্দীপ্ত উজ্জ্বল কক্ষে বসিয়া বৈদ্যুতিক পাখার শান্তিময় আশ্রয়ে ঝিমাইতে ঝিমাইতে ইঁহারা সারা বাঙ্গালার স্বপ্ন দেখেন। এইরূপ স্বপ্নযোগেই বোধ হয় তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন যে, উর্দ্দু না শিখিলে বাঙ্গালী মুসলমানের সর্ব্বনাশ হইবে। কলিকাতাবাসী এই শ্রেণীর লোকগণ পল্লীবাসী কোটি-কোটি মুসলমানের ভাষা-সমস্যা লইয়া কেন যে মাথা ঘামাইয়া থাকেন (অবশ্য দয়া করিয়া), তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আর তাহার অভিজ্ঞতার মূল্যই বা কতটুকু ?

প্রাচীন পন্থার প্রতি লোকের মোহ উৎকট ধরণের। প্রাচীনের মোহাবিষ্ট মানুষ সকল প্রকার সংস্কারকেই বিদ্বেষের চক্ষে দেখিয়া থাকে। আমরা যে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে নানারূপ সংস্কার ও পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে চাহিতেছি, হয় ত প্রাচীনপন্থিগণ তাহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন তুলিবেন। কিন্তু তাঁহাদের যুক্তিহীন প্রতিবাদে কর্ণপাত করা সমাজের জন্য কোনমতেই মঙ্গলজনক নহে।

উর্দ্দুকে শিক্ষার বাহন রূপে গ্রহণ করিয়া যে শিক্ষা-পদ্ধতি কিছুদিন পূর্ব্বেও সমাজের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহা যে ভয়ঙ্কররূপে অনিষ্টকর, এখন অনেকেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। সেই জন্য ছেলেদেরকে প্রথম হইতেই

বাঙ্গলা পড়াইবার প্রতি অনেকের প্রবৃত্তি হইয়াছে। উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে বাঙ্গলা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুফলও ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। চির অবহেলিত বাঙ্গলা ভাষাকে গ্রহণ করিয়া আজ মুসলমান-সমাজের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার অত্যাশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুগযুগ উর্দ্দু ফারসীর চর্চ্চা করিয়া বাঙ্গালী মুসলমান যাহা করিতে পারে নাই, বাঙ্গলা ভাষার সাধনা করিয়া অল্প দিনের মধ্যে তাহারা অত্যাশ্চর্য্য ফল লাভ করিয়াছে। সাধারণের শিক্ষার পথ ত সুগম হইয়াছেই, তা ছাড়া হিন্দু সাহিত্যের পার্শ্বেই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর একটা স্থায়ী মোস্‌লেম সাহিত্যও গড়িয়া উঠিতেছে। মুসলমানের বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চা করিবার পর হইতে যে কয়েক জন প্রতিভাবান সাহিত্য-রথী সমাজে যশঃ বিকীরণ করিতেছেন, তাঁহারা প্রত্যেক সাহিত্যের গৌরবের পাত্র। সাহিত্য, উপন্যাস, জীবনী, ইতিহাস, কবিতা, সমালোচনা প্রভৃতি বিষয়ে বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমান যাহা দান করিয়াছে, তাহার মূল্য নিতান্ত অল্প নহে; ইহাতে বাঙ্গলা সাহিত্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইয়াছে। মুসলমান বাঙ্গলা চর্চ্চা না করিলে আমরা এ সব পাইতাম না।

প্রাচীন পন্থীদের সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া একদল মুসলমান বাঙ্গলা ভাষাকে অবলম্বন করিয়া যে শুভফল লাভ করিল, তাহা ভাবিতেও আনন্দ হয়। কিন্তু শুভ মুহূর্ত্তের সূচনায় আবার গণ্ডগোল আসিয়া উপস্থিত হইল। এবার যে গণ্ডগোল আরম্ভ হইল, তাহাও সেই আরবী ও উর্দ্দু সমস্যা লইয়া! বাঙ্গলাকে মাতৃ-ভাষারূপে গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যবর্ত্তিতায় লেখা-পড়া করিলে, ধর্ম্মের প্রতি লোকের ভক্তি নাকি একেবারেই লোপ পায়! এই অযৌক্তিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া একদল সমাজ-রথী মুসলমানের শিক্ষার জন্য এক নূতন ও অদ্ভুত পন্থা উদ্ভাবন করিলেন। ইহা

হইতে প্রাচীন ও নব্য প্রণালীর সমন্বয়ে একটি মধ্য-পন্থা—আত্ম-প্রকাশ করিল, "নিউ স্কীম জুনিয়ার-সিনিয়ার মাদ্রাসা" প্রথার মধ্যে। এই নিউ স্কীম মাদ্রাসাগুলিতে নাকি ইস্‌লাম অক্ষত ও জীবিত থাকিবে!

নিউ স্কীম মাদ্রাসা প্রথা নূতন আর কিছু নহে। প্রাচীন পন্থীদের আদর্শ অনুসারে এক সুবোধ সরল শিশুর স্কন্ধে এক সঙ্গে চার পাঁচটা ভাষার বোঝা চাপাইয়া দিবার যে অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক প্রথা প্রচলিত ছিল, সেই জঘন্য প্রথাটিরই একটি বৃহৎ সংস্করণ মাত্র। পূর্ব্ব প্রথা হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, ইহা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা মনোনীত ও সাহায্যকৃত।

এই সবেমাত্র মুসলমান প্রাচীন উর্দ্দু-ফারসীর মোহ কাটাইয়া ধীরে ধীরে শিক্ষার পথে অগ্রসর হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে তাহার টুঁটি চাপিয়া মারিবার জন্য ধর্ম্মের নামে তাহাকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিবার এক প্রধান কৌশল এই জুনিয়ার-সিনিয়ার মাদ্রাসা! কাহার দ্বারা কেমন করিয়া, কি অবস্থার মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত হইল তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিবার অবসর নাই। তবে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে ইহা বলিতে পারি যে, এই প্রথা সমাজের ভয়ঙ্কর অনিষ্ট সাধন করিতেছে। সমাজের মঙ্গলের জন্য অচিরেই এই প্রথাকে রহিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান প্রচলিত মাদ্রাসা প্রথার মধ্যবর্ত্তিতায় শিক্ষা পাইতে থাকিলে কোনও কালেই মুসলমানের ভাগ্যে উচ্চশিক্ষা লাভ ঘটিবে না। "Jack of all trade, but master of none" বলিয়া যে একটা কথা আছে, মাদ্রাসা সম্বন্ধে তাহা বিশেষ ভাবে খাটে। মাদ্রাসা প্রথা মুসলমানকে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিবার ভাণ করিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম শিক্ষা দেয় না। সমগ্র সভ্য-জগতের সংস্পর্শ হইতে মাদ্রাসার ছাত্রগণকে বহুদূর করিয়া দেয়।

এই প্রথা কোমলমতি বালকগণের মধ্যে এমন বিকটভাবে একটা একটানা নাকি-নাকি ভাব, তেজহীন, নীরস মনোভাব আনিয়া দেয় যে, মনে হয় না উহারা বর্ত্তমান জগতের লোক। বরং মাদ্রাসার ছাত্রদিগকে দেখিলে মনে হয়, উহারা যেন সেই মধ্য যুগের সংসার বিরাগী দুঃখবাদী সন্ন্যাসী ছাত্র! এই কর্ম্ম যুগে পাদ্রীগোছের ছাত্রদিগকে লইয়া আমাদের কোনও উপকার হইবে না।

জুনিয়ার-সিনিয়ার মাদ্রাসা পদ্ধতির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান দোষ এই যে, ইহার মধ্যবর্ত্তিতায় কোন বিষয়ই ভাল করিয়া শিক্ষা হয় না। উর্দ্দু, আরবী, ইংরাজী, বাঙ্গলা (কোথাও কোথাও ফারসী) এই কয়েকটী ভাষা ছেলেদিগকে শিক্ষা করিতে হয়। ছেলেরা ত আর মেশিন নহে যে তাহাদের দ্বারা যদৃচ্ছা কাজ করাইয়া লইতে হইবে। একসঙ্গে এত চাপ সহ্য করিবার ক্ষমতা কোথায়? ছেলেদের অভিভাবকগণকে মাদ্রাসার সমর্থকগণ আশ্বাস দিয়া থাকেন যে, মাদ্রাসা প্রথার মধ্যে ইংরাজীর সহিত আরবী ও 'দীনী-এলেম' শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, ইহাতে ছেলেদের 'দীন' (ধর্ম্ম) ও দুনিয়া বজায় থাকিবে। ইহার উপর আবার লোভ দেখান হইয়াছে যে, এই শিক্ষার মর্য্যাদা ঠিক ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষার মতই হইবে। আর যাই কোথা! দীন-দুনিয়া দুই ত বহাল থাকিবে, তদুপরি সরকারী চাকুরীও ভাগ্যে জুটিয়া যাইবে। এমন সর্ব্বফলপ্রদায়িনী পদ্ধতি ছাড়িয়া অন্য দিকে কি কাহারও মন ধরে? এই সকল মোহে পড়িয়া দেশের চতুর্দ্দিকে মাদ্রাসা বিস্তার আরম্ভ হইয়াছে। জুনিয়ার মাদ্রাসাকে ইংরাজী হাই স্কুলের তুল্য মর্য্যাদা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা ভুল কথা। মাদ্রাসার পাঠ্য-প্রণালীর প্রতি একবারমাত্র চোখ বুলাইলে সেইরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু বিশেষ মনোযোগ সহকারে তুলনা করিলে

উভয়ের মধ্যে বহু পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। মাদ্রাসায় গণিত-শাস্ত্র প্রবেশিকা হইতে অনেক কম শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে মাদ্রাসা-পাশ-করা ছাত্রের আই-এস্-সি, বি-এস-সি পড়িবার কোনই সুবিধা হয় না। মাদ্রাসা পাশ করা ছাত্রের আই-সি-এস, বি-সি-এস প্রভৃতি প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়া একরূপ অসম্ভব। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের সাধারণ জ্ঞান যতটা হয়, মাদ্রাসার ছাত্রদের তাহার দশ অংশের একাংশও হয় না। (বর্ত্তমান প্রবন্ধে উভয় প্রথার তুলনা মূলক সমালোচনা সম্ভব হইবে না, ইহার জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা আছে।) ইংরাজী স্কুলের শিক্ষাকেই আমরা অসম্পূর্ণ বলিয়া থাকি, কিন্তু মাদ্রাসা তদপেক্ষাও অসম্পূর্ণ, অসন্তোষজনক ও ত্রুটিবহুল। এখানে শিক্ষা হয় না বলিলেই চলে। যদি বুঝিতাম যে, আরবীটা খুব ভাল পড়া হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ আরবী শিক্ষার কারণেও উহাকে সমর্থন করিবার বাহ্যিক হেতু থাকিত। কিন্তু জুনিয়ার-সিনিয়ার মাদ্রাসা পাশ করা ছেলেরা আরবীও ভাল করিয়া শিখে না। অথচ এই মাদ্রাসা শিক্ষার দিকে সমাজের বিষম ঝোঁক পড়িয়া গিয়াছে। মাদ্রাসা না হইলে যেন সমাজ ও ধর্ম্ম টিকে না, সবই একেবারে গোল্লায় যাইবে !

যে সকল মহারথী মাদ্রাসা প্রথাকে উৎকৃষ্ট জানিয়া এতদিন তাহার প্রচারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাঁহাদের অনেকের ভ্রম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অনেকেই এখন বুঝিয়াছেন যে মাদ্রাসা প্রথায় আশানুরূপ শিক্ষা হয় না। অত্যধিক বিষয়ের চাপে ছেলেদের মস্তিষ্ক বিব্রত হইয়া পড়ে। কিছুদিন হইল দুই একজন স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর সংবাদপত্রে এ বিষয়ে দুই একটা গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। অপর পক্ষে স্বয়ং গবর্ণমেণ্টও এই মাদ্রাসা প্রথার গুণ বর্ণনা করিয়া অবশেষে স্বীকার করিয়াছেন ঃ—

"But on the other hand, as one Inspector says, nothing is likely to perpetuate the present unfortunate communal differences more than the separate education of members of the different communities. He goes on to add :—The Maktabs and Madrassahs are extremely inefficient. This is not prejudiced criticism, but is the unanimous verdict of the Mohamedan Inspectors. It is extremely likely that the products of such institutions will ever be able to compete successfully with those, who have been taught in ordinary high schools."

ভাল ভাবে উচ্চ শিক্ষা দিবার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবলমাত্র ধর্ম্ম শিক্ষাকেই শিক্ষাদানের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া, সেই আদর্শ অনুযায়ী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলে তাহার যে অবশ্যম্ভাবী ফল হয়, মাদ্রাসা-গুলি তাহাই প্রসব করিতেছে মাত্র। যাহাকে ইংরাজীতে বলে Liberal Education, মাদ্রাসায় তাহা শিক্ষা দেওয়া হয় না। সেই জন্য ছেলেদের মনও প্রশস্ত হয় না। ধর্ম্মশিক্ষার নামে সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামী শিক্ষা হয় মাত্র। যখন দেখা যাইতেছে যে, মাদ্রাসা প্রথা Liberal Education মোটেই দিতে পারে না, এবং ইহাও দেখা যাইতেছে যে, উহা কার্য্যোপযোগী শিক্ষা দিতেছে না, বরং শিক্ষার নামে ছাত্রদের অনিষ্ট সাধন করিতেছে, তখন তাহার সংশোধন করিবার জন্য সমাজ-রথীদের একটা কিছু করা কর্ত্তব্য। ইহার প্রতিবিধান না হইলে সমাজের উন্নতি সুদূরপরাহত।

সংসারে সর্ব্বত্র যেরূপ, শিক্ষা-ক্ষেত্রেও সেইরূপ উপযুক্ত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র না পাইলে ছেলেদের বুদ্ধি-বৃত্তির ভালরূপ বিকাশ হয় না। প্রতি-যোগিতাই মানুষকে অনেক সময় উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দেয়।

মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে উপযুক্ত প্রতিযোগিতার কোনও সুযোগ পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টকেও একটা কথা বলিয়া রাখা উচিত মনে করিতেছি। গবর্ণমেণ্ট আপন রিপোর্টে যে বিষয়ে প্রতিকূল মন্তব্য প্রদান করিতেছেন, কেন যে তাহাকেই বজায় রাখিবার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। মুসলমানের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে-ভাবে অর্থব্যয় করেন, তাহার পরিবর্ত্তে সেই অর্থ যদি সাধারণ স্কুল-কলেজে মুসলমানের শিক্ষার জন্য ব্যয় করেন, তাহা হইলে তাহাতে মুসলমানের প্রকৃত উপকার হইবে। মক্তব-মাদ্রাসায় ব্যয়িত অর্থগুলিকে যদি Secondary ও higher education-এর জন্য প্রদান করেন, তাহা হইলে মুসলমানের অনেক উপকার হইবে। গবর্ণমেণ্টের ঐ অর্থ সাহায্য পাইলে দেশের অনেক মৃতপ্রায় স্কুল-কলেজ সতেজ হইয়া উঠিবে, এবং অনেক নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। এইভাবে মুসলমানের উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হইয়া পড়িবে, দেশে দেশে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি লেখা পড়া করিয়া দেশের অন্ধকার সমবেতভাবে দূর করিতে সহায়তা করিবে। কিন্তু এদিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি নাই বলিলেই চলে। অজস্র অর্থ অপাত্রে ব্যয়িত হইতেছে, অথচ নামের বেলায় দেশ-বিদেশে ঘোষণা করা হইতেছে যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মত এমন মোস্‌লেম-প্রীতি আর কাহারও নাই।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, কি কি উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতিকে সর্ব্বদোষমুক্ত করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা সম্ভব হইবে। গতানুগতিকতার মোহে ডুবিয়া থাকিলে আর চলিবে না। পৃথিবীর অপরাপর দেশের শিক্ষা-পদ্ধতিগুলি ভাল করিয়া পাঠ করিতে হইবে। শিক্ষা প্রচারের ইতিহাসের প্রতি বিশেষ নজর রাখিতে হইবে।

ইহার জন্য দেশের সর্ব্বশ্রেণীর সমাজের উদার ও সংস্কারমুক্ত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। শিক্ষাভিজ্ঞ সমাজের বিশিষ্ট নেতৃবর্গকে লইয়া একটি শিক্ষা-সমিতি গঠন করিতে হইবে। এই কমিটি শিক্ষা-পদ্ধতির খসড়া প্রস্তুত করিবে। তৎপর তাহার সমালোচনার জন্য সমাজের সুধীবর্গকে আহ্বান করা হইবে। এইরূপ বাদানুবাদ হইতে নিশ্চয় একটা কিছু সার জিনিষ গড়িয়া উঠিতে পারে, এরূপ আশা করা যায়। শিক্ষা-পদ্ধতির যত ভিত্তি পরিবর্ত্তন হউক না কেন, একটা বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি রাখিতে হইবে—বাঙ্গালা ভাষা যেন কিছুতেই অবহেলিত না হয়। আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে বাঙ্গলাকে প্রধান স্থান না দিলে সমাজের কল্যাণ সুদূরপরাহত। মাতৃ ভাষার চর্চ্চা করিয়াই জাতির উন্নতি হয়। বাঙ্গালী মুসলমানকে বাঙ্গলা ভাষাকেই মাতৃ-ভাষা রূপে গ্রহণ করিয়া উন্নতির পথ সুগম করিয়া লইতে হইবে।

মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষাপ্রণালী

বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য যে অত্যন্ত বিড়ম্বিত, তাহাদের ভবিষ্যৎ যে ঘোর মেঘাচ্ছন্ন, তাহা চারিদিকের অবস্থা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে। এক দল নেতা তাহাদিগকে প্রগতিশীল সকলবিধ কর্ম্মপদ্ধতি হইতে নিয়ত প্রতিনিবৃত্ত করিতেছেন। এই সব নেতার প্রচারের ফলে মুসলমান আজ জাতীয় আন্দোলনে পশ্চাৎপদ, রাজনীতিতে অনগ্রসর এবং নারী-প্রগতির সকল কর্ম্মধারায় পরাঙ্মুখ। হিন্দুরা যেখানে স্বরাজ ও স্বাধীনতার আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত, আমাদের সমাজ সেখানে চাকরির উমেদারি করিবার জন্য লালায়িত। তার পর আর একটা অভিনব উপসর্গ আসিয়া জুটিয়াছে তাহাদিগের শিক্ষা সমস্যা লইয়া। এবিষয়ে আমাদের তথাকথিত নেতারা যে-পন্থা অবলম্বন করিতে সমাজকে উপদেশ দিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল। ইহাতে সাধারণভাবে সমাজের জন্য উচ্চ শিক্ষার পথ যে একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে, তাহা বুঝিবার মত দূরদৃষ্টি নেতাদের নাই। আর বুঝিবেনই বা কি করিয়া? নিজ নিজ সন্তানসন্ততি ও আত্মীয়বর্গের জন্য ত এ ব্যবস্থা নয় যে সহজেই ভ্রম দূর হইয়া যাইবে ;—এ ব্যবস্থা হইতেছে আপামরসাধারণ মুসলমানদের জন্য। সাধারণের জন্য এক শ্রেণীর শিক্ষাপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিয়া, আর নিজেদের সন্তানসন্ততির জন্য উচ্চ শিক্ষার সহজ পথটি সংরক্ষিত রাখিয়া আমাদের নেতারা এই যে সমাজের মধ্যে শিক্ষার বিভিন্নতা সৃষ্টি করিতেছেন, ইহাতে কিছুদিন নেতাদের সন্তানাদির চাকরি-বাকরির পথ সুগম হইতে পারে, কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত সমগ্র সমাজকে জ্ঞানগরিমা ও শিক্ষা-বিষয়ে দেউলিয়া না করিয়া

ছাড়িবে না। আমি জোর গলায় বলিতে পারি মক্তব-মাদ্রাসায় কি শিক্ষা দেওয়া হয়, সে-বিষয়ে আমাদের নেতারা কোন সংবাদই রাখেন না। যদি তাঁহারা তাহা স্বচক্ষে দেখিতেন, তবে বুঝিতেন, সেখানে যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা সমাজের পক্ষে পর্য্যাপ্ত ত নহেই, বরং ধ্বংসকর। তাঁহারা দেখিতেছেন, যখন হিন্দুরা উহার বিরোধিতা করিতেছে, তখন নিশ্চয় উহা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক। এইরূপ রেষারেষি ও জেদাজেদির বশীভূত হইয়া নেতারা সারা সমাজটার ক্ষতি করিতে বসিয়াছেন!

মুসলমানদের জন্য বিশেষ শিক্ষানিকেতন ও বিশেষ পাঠ-ব্যবস্থার ওকালতি করিয়া এবং অবশেষে তাহাই সমাজকে গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়া, আমাদের নেতারা মুসলমান সমাজের যে সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন, তাহার জ্বালা সমাজ অচিরেই অনুভব করিবে। দেশে মক্তব-মাদ্রাসা ব্যাপকভাবে প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ হইতে উচ্চশিক্ষা একেবারেই উঠিয়া যাইবে—জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন সাহিত্য প্রভৃতির প্রতি তাহারা বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িবে এবং সমগ্র সমাজে গোঁড়ামি, ভণ্ডামি ও অন্ধ সংস্কারের প্রাবল্য বাড়িয়া যাইবে। হিন্দুরা বাধা দিতেছে, এই অজুহাতে যদি একটা অপদার্থ বিষয়কে সমর্থন করিতে হয়, তবে তাহা অপেক্ষা মূর্খতা ও আত্মঘাতী কার্য্য আর কিছুই হইতে পারে না। অনেকে এই কারণে ইহাকে সমর্থন করেন; তাই এই প্রথার অন্তর্নিহিত দোষগুণের বিচার করিবার মত ধৈর্য্য তাঁহাদের নাই। যখন বলা হয়, মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষাপদ্ধতিতে 'দীন-দুনিয়া',—ধর্ম্ম ও সংসার সবই একাধারে পাওয়া যাইবে, তখন তাঁহারা বিনা বাক্যব্যয়ে ইহাকে সমর্থন করিতে অগ্রসর হন। তাঁহাদিগকে সানুনয়ে অনুরোধ করি, ইহার ভিতরে কি আছে, না-আছে তাহা দেখিবার জন্য একটু চেষ্টা করুন—সংস্কারমুক্ত হইয়া দেখিলে বুঝিবেন, ইহা একেবারেই অন্তঃসারশূন্য।

মক্তব-মাদ্রাসাগুলিকে অব্যাহত রাখিবার জন্য সম্প্রতি মৌলবী এ. কে. ফজলুল হক সাহেব কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় যে যুক্তি দিয়াছেন, তাহা যেমন ছেলেমানুষী, তেমনই ভয়ঙ্কর। মক্তব-মাদ্রাসায় পড়াইতে না পারিলে লোকেরা ছেলেদের মূর্খ রাখিবে, তবুও সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়িতে দিবে না, অতএব তাহাই প্রচলিত রাখিতে হইবে! কি চমৎকার যুক্তি? —উপযুক্ত নেতার মত যুক্তি বটে। লোকের ধর্ম্মান্ধতার অনলে এই ভাবে ইন্ধন যোগাইতে না পারিলে দীর্ঘকাল ধরিয়া সমাজের নেতা হওয়া যায়! কিন্তু সমাজের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তার করা যে-সব নেতার কর্ত্তব্য, তাঁহাদের মুখে এমন উক্তি শোভা পায় না। মক্তব-মাদ্রাসায় যেরূপ কুশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে প্রত্যেক শিক্ষাবিৎ নেতার ঠিক উল্টা কথাই বলা উচিত। বরং সমাজ আরও কিছুকাল অশিক্ষিত থাকুক সেও ভাল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যেন কিছুতেই মক্তব-মাদ্রাসার প্রচলন না হয়। বহু বৎসর পূর্ব্বে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের সময় মৌলবী-মোল্লারা ত জোর গলায় বলিয়াছিলেন যে, সমাজ মূর্খ থাকিবে তবুও ইংরেজী শিখিবে না। কিন্তু সে অহঙ্কার বেশী দিন থাকে নাই। সমাজকে ইংরেজী শিখিতে হইয়াছে, এবং মৌলবী-মোল্লার সন্তানসন্ততিরাও ইংরেজী শিখিয়াছে; অথচ তাহারা কেহই কাফের বা খ্রীষ্টান হইয়া যায় নাই। তার পর কিছুদিন প্রবল ভাবেই ইংরেজী শিক্ষা চলিতে থাকে। ইংরেজীর প্রভাবে মুসলমানেরা ধীরে ধীরে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে লাগিল। সমাজের চারিদিকে ইংরেজী শিক্ষার প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইল। হিন্দুরা পূর্ব্ব হইতেই সাধারণ বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রথম প্রথম তাহার প্রভাবে সামান্য এক-আধটু কুফল দেখা দিলেও, কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত তাহাতে হিন্দুদের উপকারই হইয়াছিল,

বিশেষতঃ বিজ্ঞান ও রাজনীতিতে তাহারা বেশ অগ্রসর হইয়া উঠিল। মুসলমানদের বেলায়ও কিছুদিন সাধারণ বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পর বুঝা গেল যে তাহারাও যদি এই শিক্ষা পাইতে থাকে, তবে তাহাদের মধ্যেও অচিরে চেতনার সঞ্চার হইবে।

কিন্তু হঠাৎ কাহার প্ররোচনায় জানি না, মুসলমানদের মনের গতি অন্যদিকে ঘুরিতে লাগিল। প্রথম প্রথম যে সরকার বাহাদুর এদেশে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহারাও কি জানি কেন, মুসলমানদের জন্য মক্তব-মাদ্রাসার প্রতি অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। এই জন্য তাঁহাদের বাছাই বাছাই কতকগুলি লোক নিযুক্ত হইল। সরকারের নিযুক্ত লোকের দ্বারা কোন বিষয়ে তদন্ত করিলে তাহার যে পরিণাম হয়, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। এই সব মনোনীত লোক সরকার যাহা করিতে চাহেন তাহাতেই সমাজের নামে এবং নিজেদের স্বাধীন চিন্তার নামে অনুমতি দিয়া থাকেন। এই প্রকারে মক্তব-মাদ্রাসার উৎপত্তি হইল। সে অনেক দিনের কথা। বলা হইল মুসলমানরাই ইহার উদ্ভাবনকর্ত্তা এবং মুসলমানদেরই ইচ্ছানুযায়ী সরকার ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন মাত্র। কিন্তু ভিতরের ব্যাপার তাহা নহে। কোন্ শ্রেণীর ধুরন্ধর এই সব মক্তব-মাদ্রাসাতে সায় দিলেন, তাহা কেহই ভাবিয়া দেখিল না। বস্তুতঃ ইহা তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনায় ও নির্দ্দেশমতই হইয়াছে। এই শিক্ষা-পদ্ধতির প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য এই প্রলোভন দেওয়া হইল যে, ইহার দ্বারা সমাজ কোরআন, হাদীস ও 'শরা-শরীয়ৎ' শিখিতে পাইবে। তারপর নানা ভাবে ইহার স্বপক্ষে প্রচারকার্য্য চলিতে লাগিল। পশ্চিম বঙ্গে মক্তব-মাদ্রাসা ততটা ব্যাপক না হইলেও অনতিবিলম্বে পূর্ব্ব বঙ্গের সর্ব্বত্র ইহা সংক্রামিত হইয়া পড়িল।

ইহা ব্যাপক হইবার আর একটা কারণ, সরকার মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষাকে প্রবেশিকার মত মর্য্যাদা দিলেন, অথচ প্রবেশিকার মত উচ্চশিক্ষা ইহাতে মোটেই হয় না। এই ভাবে কিছুদিন বেশ চলিল, তারপর মোমিন-কমিটি মাদ্রাসা-পদ্ধতিকে চিরস্থায়ী রূপ প্রদান করিলেন। মোমিন-কমিটির শেষ সিদ্ধান্ত অনুসারে মাদ্রাসাগুলি নিতান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও মধ্যযুগীয় আদর্শ প্রাপ্ত হইল।

একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই নিকৃষ্ট পদ্ধতির প্রতি সরকারের আসক্তির কারণ কি? উত্তর অতি সহজ। সরকার এদেশের শিক্ষা-পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার পূর্ণ অধিকার নিজ হস্তে রাখিতে চান। নানা কারণে, বিশেষতঃ হিন্দুদের সতর্কতার কারণে, সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব চালাইতে পারেন না, কিন্তু তাই বলিয়া কি মুসলমানদের শিক্ষা-পদ্ধতিকে স্বীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিতে ছাড়িবেন? তাঁহারা যে মুসলমানদের সর্ব্ববিষয়ে মা-বাপ, বিশেষতঃ ধর্ম্মশিক্ষার নামে মুসলমানেরা যখন সেই কর্ত্তৃত্ব সরকারের হাতে ছাড়িয়া দিতে চায়। ব্যাপকভাবে সাধারণ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিয়া হিন্দু যুবকগণ যেরূপ বেপরোয়া হইয়া উঠিতেছে, তাহা দেখিয়াও কি সরকার শিক্ষালাভ করিবেন না? সুতরাং অর্থ দিয়া, মোটা মোটা পদ সৃষ্টি করিয়া, এই সব নিকৃষ্ট শ্রেণীর মক্তব-মাদ্রাসার প্রসারে সাহায্য করা হইতে লাগিল। সাধারণ বিদ্যালয় অপেক্ষা মক্তব-মাদ্রাসাকে সরকার যে অধিক সাহায্য করেন তাহার মূলে অনেক রহস্য আছে—তাহা মাননীয় নেতাদের ভেদ করিবার যোগ্যতা নাই।

মৌলবী ফজলুল হক সাহেবের যুক্তি দেখিয়া বাস্তবিকই হাসি পায়। হক সাহেব ভুল কথা বলিয়াছেন। মক্তব না থাকিলে মুসলমান মূর্খ

থাকিবে না, কিন্তু থাকিলে সমাজ কুশিক্ষা ও নিকৃষ্ট ধরণের শিক্ষা পাইবে ; ফলে তাহাদের অন্ধ গোঁড়ামি বাড়িয়া যাইবে। ধোকায় পড়িয়া এই সব নেতা নিজেরা মক্তব চান, অথচ তাহাই সমাজের নামে প্রচার করিতেছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যেখানে মক্তব নাই, সেখানে কি সাধারণ বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্র পড়ে না ? গরীবের ছেলেরাও সে-সব বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিতেছে। আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আজিজুল হক, হক সাহেব, খানবাহাদুর মোমিন-সাহেব প্রমুখ মহাভাগ নেতাদের ছেলেরা ও আত্মীয়েরা কোথায় লেখাপড়া শেখে ? সমাজের দরিদ্র ছেলেরাও যদি সেইখানে লেখাপড়া শেখে, তবে কি এমন ক্ষতি হইবে ? আমাদের নেতাদের বাড়ির ছেলেপুলেরা কেহই মক্তব-মাদ্রাসায় পড়ে না, তবে সমাজের জন্য মক্তবের প্রতি এত টান কেন দেখান হইতেছে ? তাই তাঁহাদের বলি সরকারী চাল ভেদ করিয়া একটু ভিতরে ঢুকিবার চেষ্টা করুন, দেখিবেন মক্তব-মাদ্রাসায় শিক্ষার ফল সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

আমি নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছি—মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষা কিছুই হয় না। দেখা গিয়াছে এক কোরআন-শরীফ পড়িতে অনেকের তিন-চার বৎসর লাগিয়াছে, অথচ সে ছেলে না জানে লিখিতে, না জানে অঙ্ক কষিতে। এইভাবে কত ছাত্রের মাথা খাওয়া হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। তিন-চার বৎসর মক্তবে পড়ার পর যদি কোন ছেলে সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়িতে আসে, তবে তাহাকে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা ব্যতীত উপায় থাকে না, কারণ সে কোরআন পড়া অথবা উর্দ্দুর দু-এক পাতা ব্যতীত অন্য কিছুই শেখে নাই। ধর্ম্মশিক্ষার নামে সমাজের ছেলেদের প্রথম জীবনের এই মূল্যবান বৎসরগুলি নষ্ট হইতে দেওয়া ঘোরতর অন্যায়। হক-সাহেবান ও মোমিন-সাহেব সেদিকে লক্ষ্য

রাখেন না। শুনা যায় নিউ স্কীম সিনিয়ার মাদ্রাসাগুলি প্রবেশিকা পরীক্ষার মর্য্যাদাপ্রাপ্ত। সরকারী নথিপত্রে সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে, কিন্তু যোগ্যতার দিক হইতে উভয় পদ্ধতির মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। একটি সিনিয়ার-মাদ্রাসা-উত্তীর্ণ ছেলের সহিত প্রবেশিকা-উত্তীর্ণ ছেলের তুলনা করিলে এই পার্থক্য বুঝা যাইবে। একটি দুইটি নয়, আমি কয়েক ডজন ছেলেকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রবেশিকা-উত্তীর্ণ ছেলে মাদ্রাসা-পাশ ছেলে অপেক্ষা অধিক জ্ঞানশালী। আর একটা কথা ভাবিয়া দেখুন—একটি ছোট শিশুর উপর যদি কয়েকটি ভাষার চাপ দেওয়া যায়, তবে সে তাহা কিরূপে সহ্য করিবে? বাঙ্গলা, উর্দ্দু, আরবী, ইংরেজী, আবার কোথাও কোথাও তৎসহ ফারসী—এই সব ভাষার সমুদ্র বাঙালী মুসলমানকে ডিঙাইতে হইবে। আমরা বাংলা দেশে কোন্ দুর্ভাগ্য লইয়া জন্মিয়াছি তাহা জানি না, কিন্তু আমাদের গুণধর নেতাদের কল্যাণে আমাদের এই সব প্রকৃতিবিরুদ্ধ বিষয় আয়ত্ত করিতেই হইবে। বস্তুতঃ মাদ্রাসার শিক্ষার ফলে আমাদের ছেলেরা না-শেখে বাংলা, না-শেখে আরবী, না-শেখে বিজ্ঞান ও শিল্প,—সব কিছুরই মিশ্রণে তাহারা হইয়া পড়ে একটা জগা-খিচুড়ী।

তাই আমরা করজোড়ে ফজলুল হক সাহেবদের অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন এ-বিষয়ে আর অগ্রসর না হন; বরং প্রচলিত সাধারণ বিদ্যালয়ের যাহাতে উন্নতি হয় তাহারই চেষ্টা করুন। সেই শিক্ষাকে একটু উন্নত-প্রণালীর করিয়া লইলেই আপাততঃ যথেষ্ট। আমূল শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজন আছে স্বীকার করি, কিন্তু তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত সাধারণ শিক্ষা প্রণালীতে ছেলেরা শিক্ষা পাইতে থাকুক—মক্তব-মাদ্রাসার কোনও দরকার নাই।

'পদ্ম ও শ্রী'-সমস্যায় মুসলমান

"—The shining lotus flowers floating on the still dark surface of the lake, their manifold petals, opening as the sun's rays, touched them at break of day and closing again at sunset, the roots hidden in the mud beneath seemed perfect symbol of creation of divine purity and beauty, of the cosmos evolved from the dark void of chaos and sustained in equlibrium by the cosmic ether (Akasha)".—Havell.

কিছুদিন পূর্ব্বে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন. হইতেছিল, তখন সেই আন্দোলনের ধারা দেখিয়া আমরা বলিয়াছিলাম—উহার মূল উদ্দেশ্য মুসলমানের কোন সত্যিকারের অভাব-অভিযোগ দূর করা নয়, বরং কোন গোপন-হস্তের কুৎসিত ইঙ্গিতেই ইহা আরম্ভ হয়। আর উহার উদ্দেশ্য ছিল এইভাবে আন্দোলন দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্যটুকু নষ্ট করিতে সরকারকে উত্তেজিত করা। যতই দিন যাইতেছে, আমাদের এই কথাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্যটুকু নষ্ট করা এই শ্রেণীর আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, আর একটা পরোক্ষ উদ্দেশ্যও আছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে উপলক্ষ্য করিয়া নানা প্রকার আন্দোলন দ্বারা যদি মুসলমান-সমাজের মধ্যে জাতীয়তা বিরোধী ভাবধারা প্রচার করা যায়, তবে প্রতিক্রিয়াশীলগণ সে সুযোগ ছাড়িবেন কেন? অভিযোগ হইল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগকে প্রেমিসরূপে গ্রহণ করিয়া

আন্দোলনকারিগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন—অতএব মুসলমানের কংগ্রেসে যোগদান করা উচিত নহে। বস্তুতঃ কংগ্রেসের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোনই সংস্রব নাই। কিন্তু যেই কংগ্রেস গণ-সংযোগের প্রস্তাব গ্রহণ করিল, অমনি প্রতিক্রিয়াশীলগণ বলিতে লাগিলেন—মুসলমান গণ-সংযোগের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে পারেন না, কারণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় "পদ্ম ও শ্রী"যুক্ত মনোগ্রাম ব্যবহার করিতেছে। তাঁহাদের যুক্তির ধারা দেখিয়া হাসিতে ইচ্ছা হয়। গত বৎসর তাঁহাদের আক্রমণের বিষয় ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা পাঠ্য পুস্তক। কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল পাওয়া গেল না। তখন 'মাথাওয়ালা' ধুরন্ধরগণ ভাবিতে লাগিলেন, "অতঃপর কি করা যায়?" বিশ্ববিদ্যালয়ের এটা-ওটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহাদের নজরে পড়িল "পদ্ম ও শ্রী"-অঙ্কিত মনোগ্রামের প্রতি। আর যায় কোথা! এখন কিছুদিন ইহা লইয়া রাজনৈতিক বাজার গুলজার হইয়া রহিবে। ইহার পর আর কি লইয়া আন্দোলন করা যাইবে? সে পরের কথা পরে ভাবা যাইবে।

অভিযোগ উঠিয়াছে—"পদ্ম ও শ্রী" ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায় ও জঘন্য পৌত্তলিকতার সহায়ক। সুতরাং মুসলমান তাহা কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারে না, তাহা ব্যবহার করিলে মুসলমানের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত লাগিবে। এ বিষয়ে আমরা নিরপেক্ষাভাবে আলোচনা করিব ও স্বাধীনভাবে স্বীয় মতামত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। "পদ্ম ও শ্রী"র মধ্যে যখন কোন কোন মুসলমান পৌত্তলিকতার গন্ধ পাইয়াছেন, তখন ব্যাপারটিকে সামান্য বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। এ সম্বন্ধে যতগুলি প্রশ্ন আপনা হইতে উঠিতে পারে, সেগুলি বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। সে বিচারে যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে, "পদ্ম ও শ্রী" পৌত্তলিকতার প্রতীক ব্যতীত আর

কিছুই নহে, তবে আমরা অম্লান বদনে বলিব যে, উহা কোন মুসলমানই ব্যবহার করিতে পারে না। শুধু তাহাই নহে, উহা কোন মুসলমানের ব্যবহার করাও উচিত নহে। "পদ্ম ও শ্রী"র বিতর্ক হইতে নিম্নলিখিত সমস্যা উঠিতে পারে :—(১) "পদ্ম ও শ্রী"র প্রকৃত অর্থ কি? উহা যদি পৌত্তলিকতার প্রতীক না হয়, তবে আপত্তির কারণ থাকিতে পারে কি না? (২) পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমানগণ ইহা ব্যবহার করিয়াছিলেন কি না, আর করিয়াছেন কি অর্থে; (৩) শব্দ বা চিহ্নকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে কি না? (৪) কোন ভাব বা আদর্শের জন্য প্রতীক ব্যবহার করা, অথবা গ্রহণ করা কি ইসলামের দৃষ্টিতে দূষণীয়? (৫) অৰ্দ্ধচন্দ্রখচিত পতাকার সহিত পৌত্তলিকতার স্মৃতিজড়িত আছে, তবুও মুসলমান কেন তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন? (৬) প্রতীক দেখিয়া মুসলমান কি পৌত্তলিকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়?—আমরা একে একে এই কয়েকটি বিষয় আলোচনা করিয়া দেখাইব যে, "পদ্ম ও শ্রী"র সহিত ইসলামের ইষ্টানিষ্টের কোন সম্বন্ধই নাই। ইসলাম এত ক্ষণভঙ্গুর ধর্ম্ম নয় যে, "পদ্ম ও শ্রী"র চাপে তাহা ধ্বংস হইয়া যাইবে! ইসলাম এই সব বাজে বিষয়ের অনেক উৰ্দ্ধে অবস্থিত।

(১) "পদ্ম ও শ্রী"র বিরুদ্ধে সব চেয়ে মারাত্মক আপত্তির কারণ এই যে, ইহা পৌত্তলিকতার প্রতীক—সাকারবাদী হিন্দুদের পুতুল পূজার নিদর্শন মাত্র। নিরাকারবাদী মুসলমান ইহা কোনও মতেই গ্রহণ বা ব্যবহার করিতে পারে না। "পদ্ম" অর্থে সরস্বতী ও "শ্রী" অর্থে লক্ষ্মীকে বুঝায়। এই দুইজন দেবী হিন্দুদের পূজার পাত্রী। বিদ্যার দেবী সরস্বতী ও ঐশ্বর্য্যের দেবী লক্ষ্মীকে অহরহঃ স্মরণ করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় "পদ্ম ও শ্রী" অঙ্কিত মনোগ্রাম প্রস্তুত করাইয়াছেন। এই প্রকার

ব্যাখ্যা ব্যতীত অন্য কোনভাবে যদি "পদ্ম ও শ্রী"কে ব্যাখ্যা দেওয়া না চলে, তবে আমরা জোর গলায় বলিব যে, ইহা ইসলামের দিক হইতে ঘোর আপত্তিকর। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যখন প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিতেছেন যে, উক্ত প্রকার অর্থে তাঁহারা "পদ্ম ও শ্রী" ব্যবহার করেন নাই, অথবা মুসলমানের ধর্ম্মে আঘাত করিবার জন্য নহে, তখন তাঁহাদের ব্যাখ্যা মানিয়া না লইবার কোনই কারণ নাই। গায়ের জোরে কাহারও ব্যবহৃত কথা ও চিহ্নের কদর্থ করিলে ন্যায় ও সত্যের অপলাপ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ "পদ্ম ও শ্রী"র যে ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন, তাহা অগ্রাহ্য করিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। তাঁহাদের মতে "পদ্ম" অর্থে পবিত্রতা ও "শ্রী" অর্থে সৌন্দর্য্য বুঝায়। মুসলমান যদি এই অর্থে "পদ্ম ও শ্রী" ব্যবহার করে, তবে তাহাতে ইসলামের অমর্য্যাদা হয় না, এবং মুসলমান হিসাবে সেই অর্থে তাহা ব্যবহার করিতে কোন আপত্তি বা দোষ নাই। হিন্দুরা যাহাই বুঝুক না কেন, যে অর্থেই ব্যবহার করুক না কেন, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যের প্রতীক, এই অর্থে যদি আমরা "পদ্ম ও শ্রী"কে গ্রহণ করি, তবে তাহাতে আমাদের ধর্ম্মহানির আশঙ্কা আদৌ থাকে না এবং ধর্ম্মানুভূতিতে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনাও থাকে না।

(২) "পদ্ম ও শ্রী" যদি এতই আপত্তিকর হইত, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান-গণ তাহা কেন নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—হিন্দুরা ঐ শব্দদ্বয় যে অর্থে ব্যবহার করেন, সে যুগের মুসলমানগণ সে অর্থ গ্রহণ করেন নাই। ইতিহাস পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, বাদশাহী আমলে মুসলমানগণ "পদ্ম ও শ্রী" ব্যবহার করিতে কখনও ইতস্ততঃ করেন নাই। মধ্য যুগে ভারতের অনেক মসজিদে এমন কি দিল্লীর জুমা মসজিদেও পদ্ম অঙ্কিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। হ্যাভেলের পুস্তকে

এমন বহু মসজিদের ফটো আছে, যাহাতে পরিষ্কারভাবে অঙ্কিত কয়েকটি "পদ্ম" দেখিতে পাওয়া যাইবে।

সুলতান মহম্মদ ঘোরী, শের শাহ, আকবর শাহ প্রভৃতি মুসলমান বাদশাহগণ নিজ নিজ নামের আগে শ্রী ব্যবহার করিতেন। সে যুগের মুসলমানও বিনা বাধায় শ্রী শব্দ ব্যবহার করিতেন। অবশ্য এই সব উদাহরণ হইতে আমরা এরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছি না যে, তাঁহারা যাহা করিতেন, আমাদিগকেও তাহাই করিতে হইবে, বা তাহাই সমর্থন করিতে হইবে। তবে এটাও দেখা দরকার, যে শব্দ অথবা সঙ্কেত পৌত্তলিকতার প্রতীক, তাহা ব্যবহার করিতে কেন তাঁহারা দ্বিধা বোধ করেন নাই? কেন তাঁহারা তাহা বিনা প্রতিবাদে ব্যবহার করিতেন? তাঁহাদের উহা ব্যবহার করিবার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহারা উহাতে পৌত্তলিকতার গন্ধ মোটেই পান নাই। তাঁহারা উহা সাধারণ ও সহজ অর্থেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সাধারণ ও সহজ অর্থ এই যুগে গ্রহণ করিতে আমাদেরই বা কেন এত আপত্তি, ইহার জন্য কেন এত মিছামিছি কোন্দল-কোলাহল? মুসলমানগণ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া পৌত্তলিকতার সহিত আপোষ নিষ্পত্তি করিতে উদ্যত হন নাই। আর পৌত্তলিকতা যে কি বস্তু সে বিষয়ে তাঁহাদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তৎসত্ত্বেও তাঁহারা "শ্রী ও পদ্মকে" বর্জ্জন করেন নাই। কারণ তাঁহারা আরও বহু বিষয়ের মত "পদ্ম ও শ্রী"কে সাধারণ অর্থেই গ্রহণ করিতেন। এই প্রকার প্রতীক ব্যবহার করিলে মুসলমান যে তদ্দণ্ডে কাফের বা পাপী হইয়া যায়, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না। সে যুগে ত আর স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনা ছিল না যে, কথায় কথায় আন্দোলন চালাইয়া মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে দুর্ব্বিসহ ও ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিবেন! তাই এ-সব

বাজে বিষয় লইয়া তাঁহারা মাথা ঘামাইতেন না। "পদ্ম" যখন পবিত্রতা ও শুচিতার অর্থে, আর "শ্রী" সৌন্দর্য্যের অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে, তখন তাহাতে কোনই আপত্তি থাকিতে পারে না। ইহাই ছিল সে যুগের মুসলমানের মনোবৃত্তি।

(৩) কোন শব্দ বা চিহ্নকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে কি-না, এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব, হাঁ, সেরূপ পারা যায়। এ সম্বন্ধে বাঙ্গলার আলেম-কুল-শিরোমণি মৌলানা মহম্মদ আক্রম খাঁ সাহেবের মূল্যবান অভিমত প্রণিধানযোগ্য। শ্রীহট্টের মৌলবী আহবাব চৌধুরী মৌলানা মহম্মদ আক্রম খাঁ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লেখেন যে, 'নমস্কার' ও 'প্রণিপাত' শব্দগুলি 'শিরক' ও পৌত্তলিকতাপূর্ণ ও 'গয়ের ইসলামী' ভাবাপন্ন কি-না? ইহার উত্তরে শ্রদ্ধেয় মৌলানা আক্রম খাঁ সাহেব "মাসিক মোহম্মদীতে" কি লিখিতেছেন তাহা দেখুন :—

"উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া কয়েকটা তীব্র শব্দ ব্যবহার করা যতটা সহজ—শাস্ত্র ও সাহিত্যের দিক দিয়া বিচার করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করা ততটা সহজ নহে। ......এ সম্বন্ধে আমাদের নিবেদন এই যে, ধাতুগত মূল অর্থের অথবা বহু প্রাচীন কালের সাময়িক ব্যবহারের হিসাবে কোন ভাষার প্রচলিত শব্দগুলির তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করা সর্ব্বত্র সঙ্গত নহে। ধাতুগত অর্থের ও প্রচলিত অর্থের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ প্রায়শই দেখা যায়। আবার দীর্ঘকাল পূর্ব্বে একটি শব্দ এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া পরবর্ত্তী সময়ে পর পর নূতন অর্থে তাহার ব্যবহার হইতেও আমরা সচরাচর দেখিতে পাই। ধাতুগত অর্থকে আঁকড়াইয়া থাকিলে, অথবা প্রাচীন যুগের সাময়িক ব্যবহারকে ধরিয়া বসিলে বাঙ্গলা ত দূরের কথা, কোন পুরাতন ও সভ্য ভাষায় কথা বলা বা প্রবন্ধ লেখা "একেশ্বরবাদী

মুসলমানের পক্ষে” সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না। কারণ যে-সব জাতি ঐ সমস্ত ভাষার বাহন, তাহাদের প্রত্যেকটিকেই দীর্ঘকাল স্থায়ী ঘোর পৌত্তলিকতার স্তর অতিক্রম করিয়াই অগ্রসর হইতে হইয়াছে এবং ইহাদের ধর্ম্ম-সাহিত্যের ও পুরাণ-ইতিহাসের সৃষ্টি, বিকাশ ও পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে প্রধানতঃ এই স্তরেরই সমসাময়িক যুগে। জনাব চৌধুরী সাহেবকে এখানে বিশেষভাবে জানাইয়া রাখিতে চাই যে, আরবী ও পার্সি সাহিত্যও এই নিয়মের অতীত নহে। উদাহরণস্বরূপে প্রচলিত বার ও মাসগুলির নামের উল্লেখ করা যাইতে পরে। মূলের হিসাবে অন্ততঃ ইহার অধিকাংশ নামই 'শের্ক' ও পৌত্তলিকতাপূর্ণ এবং'গয়ের ইসলামী ভাবাপন্ন।' কিন্তু আমরা সকলেই ঐগুলিকে খুব স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। “মন্বন্তর” কথাটা আমরা সকলেই ব্যবহার করি, কিন্তু ব্রহ্মা বা মনুতে এবং তাহার অন্তরি হওয়ার পুরাণ-কথিত প্রভাবে কেহই বিশ্বাস করি না। মূলের সমস্ত ধাতুগত তাৎপর্য্য লোপ পাইয়া এখন উহার একমাত্র প্রচলিত অর্থ দাঁড়াইতেছে দুর্ভিক্ষ। শ্রীফল, শ্রীনগর, এমন কি চৌধুরী ছাহেবের (উক্ত মৌলবী সাহেব) মাতৃভূমি শ্রীহট্ট সম্বন্ধেও এই কথা। প্রাচীনকালে “'বা'ল” নামক বোতের (মূর্ত্তি) সেখানে পূজা হইত বলিয়া শাম (সিরিয়া) দেশের একটি নগরের নাম হয়—বা'লবক্ক। মুছলমানেরা হজরতের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত নিঃসঙ্কোচে এই নামটি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। পার্সিকেরা আলোক ও অন্ধকারের অথবা পাপ ও পুণ্যের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র খোদার কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন। প্রথমটির নাম ছিল ঈজদ, দ্বিতীয়টীকে বলা হইত আহরমন। পারস্যে মোছলেম প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঈজদ শব্দটাকে মুছলমানেরা খোদা অর্থে সাধারণভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন, পার্সি কাব্য ও ধর্ম্ম-সাহিত্য

ইত্যাদিতে এই শব্দের বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। পারস্যের এক 'বোতের' (মূর্ত্তির) নাম ছিল 'খোদা'—প্রাগ্‌এছলামিক পার্সি-সাহিত্যে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় বলিয়া কোন কোন পার্সি অভিধানে বর্ণিত হইয়াছে, এই অজুহাতে কোন কোন আলেম খোদা শব্দ ব্যবহার করাকে 'শের্ক' ও পৌত্তলিকতা বলিয়া ঘোর আপত্তি উত্থাপন করেন। কিন্তু দেশের সমগ্র আলেম সমাজ একবাক্যে ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন,—অভিধানের ঐ উক্তি সত্য হইলেও দীর্ঘকাল হইতে ঐ শব্দটি ঈশ্বর অর্থেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, সুতরাং উহার ব্যবহার কোন ক্রমেই অবৈধ হইতে পারে না। এখানেও আমাদের প্রথম নিবেদন এই যে, 'নমস্কার' ও 'প্রণিপাত', শব্দ দুইটীর ধাতুগত মূল তাৎপর্য্য যাহাই থাকুক না কেন, বর্ত্তমান যুগের প্রচলিত ব্যবহারে অভিবাদন এবং সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপক সম্ভাষণ ব্যতীত উহার অন্য কোন অর্থই গৃহীত হইতে পারে না, সুতরাং উহার ব্যবহার অবৈধ নহে।" ("মাসিক মোহাম্মদী"—৭ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৯ সাল—পৃষ্ঠা ৫৩০—৫৩১)।

শ্রদ্ধেয় মৌলানা আক্রম খাঁ সাহেবের এই সুচিন্তিত অভিমতের পর টিকা টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন। 'প্রণাম ও 'প্রণিপাত' সম্বন্ধে মৌলানা সাহেব যে-সব কথা বলিয়াছেন, 'পদ্ম ও শ্রী' সম্বন্ধেও সেই কথাই বলা চলে ; এবং শ্রদ্ধেয় মৌলানা সাহেবকে তাঁহার পূর্ব্বে উক্তির কথা স্মরণ করাইয়া অনুরোধ করিতেছি—এই প্রকার জাতি-বিদ্বেষমূলক বাজে আন্দোলন হইতে নিরস্ত থাকুন। ইহাতে সনাতন ইসলামের মহিমা বৃদ্ধি পাইবে না, বরং খর্ব্বই হইবে। মুসলমানের কল্যাণের জন্য শক্তি নিয়োজিত করিবার ক্ষেত্রের অভাব নাই, যেমন পবিত্র কোরআনের তফসির (ভাষ্য) লেখা।

(৪) কোন আদর্শ অথবা ভাবের পরিবর্ত্তে মুসলমান প্রতীক ব্যবহার

করিতে পারে কি-না? ইসলামের ইতিহাস এই প্রশ্নের উত্তরে বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে বলিবে, হাঁ, তাহা পারে। একটিমাত্র বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোথাও প্রতীক ব্যবহার করা নিষিদ্ধ নহে। সে ক্ষেত্র হইতেছে বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্ তা'লা। ইসলাম নিরাকারবাদী, সুতরাং আল্লাহর কোনওরূপ কাল্পনিক প্রতিমূর্ত্তি অথবা তাঁহার বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যকে প্রতীকরূপে মুসলমান ব্যবহার করিতে পারে না। মুসলমান তাঁহাকে নিরাকারভাবেই পূজা করিয়া থাকে। তাঁহাকে আকারে আনিতে যাওয়া ইসলামের সুমহান আদর্শ অনুসারে ঘোর পাপ, সে পাপের কোনরূপ মার্জ্জনা নাই। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার ব্যাপারে কোনও প্রতীক মুসলমানগণ ব্যবহার করিতে পারে না। এ বিষয়ে মুসলমানের বিশ্বাস এতদূর দৃঢ় যে, আল্লার মূর্ত্তি ত কোন্ ছার, উপাসনার আগার মসজিদকেও সে পূজার পাত্র বলিয়া মনে করে না। মসজিদ তাহার উপাসনার জন্য একটা ঘর মাত্র। কিন্তু আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ব্যাপারে অথবা অন্য কোন আদর্শের জন্য প্রতীক ব্যবহার করা একটুও অন্যায় নহে। দু'একটা উদাহরণ দিয়া ব্যাপারটি বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কোন মুসলমান শাসন-কর্ত্তা যদি দেশের লোকের মধ্যে বীরত্বের ভাব জাগাইবার জন্য জাতীয় পতাকায় তলোয়ার, বর্শা, বল্লম, কামান, গোলা ইত্যাদির প্রতীক ব্যবহার করেন, তবে তাহা ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায় হইবে না। সেইরূপ যদি কোন মজুর সমিতি তাহাদের পতাকায় কাস্তে, লাঙ্গল ইত্যাদি ব্যবহার করে, তবে তাহাও অন্যায় হইবে না। ন্যায় বিচারের প্রতীকস্বরূপ যদি কোন পতাকায় দাঁড়িপাল্লা থাকে, তবে তাহাও ইসলাম-বিরোধী কাজ হইবে না। মুসলমানগণ সাধারণতঃ যে অর্দ্ধচন্দ্রখচিত পতাকা ব্যবহার করেন, তাহাও ত প্রাচীন পৌত্তলিক জাতির একটা প্রতীক মাত্র। যাঁহারা

'পদ্ম-শ্রী'র নামে পৌত্তলিকতার ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া উঠেন, তাঁহারা হয় ত জানেন না যে, অর্দ্ধচন্দ্রটা হজরত মোহম্মদের প্রথম যুগের পতাকা নহে। এক্ষেত্রে সংক্ষেপে অর্দ্ধচন্দ্রের ইতিহাস ও তাহা কিরূপে মুসলমানের জাতীয় পতাকায় স্থান পাইল, এখানে তাহার চমৎকার কাহিনীটি পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিব।

(৫) মুসলমানগণ বর্ত্তমানে তারকাসহ যে অর্দ্ধচন্দ্রখচিত পতাকা ব্যবহার করেন, তাহা প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের পতাকায় মোটেই ছিল না। তবে কখন ও কাহার দ্বারা এই প্রকার প্রতীক পতাকায় আশ্রয় পাইল? প্রাচীন যুগে বহু পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রটা তাহাদের চন্দ্রদেবীর প্রতীকস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। উহা শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্থে ব্যবহৃত হইত। কার্থেজ, মিশর, প্রাচীন আরব, ইসিরিয়া প্রভৃতি দেশে চন্দ্রদেবী পূজিতা হইতেন। একটা কিছুর প্রতীকস্বরূপ চন্দ্র-প্রতীক আজিও বহু স্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথম যুগের মুসলমানগণ এই চন্দ্র দেবীকে প্রতীক হিসাবে কোথাও ব্যবহার করেন নাই। ক্রুসেড্ যুদ্ধের সময় মুসলমান ও খৃষ্টানদের ব্যবহৃত পতাকার যে-সব ড্রইং পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যাইবে যে, আরবদের পতাকায় কোনরূপ ডিজাইন ছিল না। কিন্তু খৃষ্টানদের পতাকায় 'ক্রুস' অঙ্কিত থাকিত। এই ঘটনার বহু যুগ পরে মুসলমানগণ যখন কনষ্ট্যান্টিনোপল অধিকার করিয়া লন, সেই সময় তথাকার অধিবাসিগণ তাহাদের পতাকায় চন্দ্র ব্যবহার করিত। ইহারা এই ঘটনার বহু পূর্ব্ব হইতেই চন্দ্রকে প্রতীকরূপে ব্যবহার করিয়া আসিতে-ছিল। কোন ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া কনষ্ট্যান্টিনোপলের অধিবাসিগণ চন্দ্রকে পতাকার মধ্যে ব্যবহার করিতে থাকে, তাহা ঐতিহাসিক হিসি-কিয়াস (Hesychius) এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—যখন ফিলিপ অব

ম্যাসিডন, বাইজানটিয়াম অবরোধ করেন (B. C. 382—336), তখন আকাশে চন্দ্র আবির্ভূত হইল। ইহাতে নগরের কুকুরগুলি এরূপ চীৎকার করিতে লাগিল যে, অবরুদ্ধ নগরের অধিবাসী ও সৈনিকগণ জাগরিত হইয়া উঠিল। পরে তাহারা তখন শত্রুকে তাড়াইয়া দিল। চন্দ্র উদয়ের কারণে তাহারা জাগরিত হইয়াছিল বলিয়া চন্দ্রদেবীর প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শনের জন্য বাইজানটিয়ানগণ অর্দ্ধচন্দ্রকেই নগরের প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করিল। এই ঘটনার বহু শত বৎসর পরে যখন সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ কনষ্ট্যান্টিনোপল (বাইজানটিয়ামের রাজধানী) অধিকার করেন, (২৯শে মে, ১৪৫৩ খৃঃ অব্দ), তখন তিনি নগরের পৌত্তলিক অধিবাসীদের অনুকরণে অর্দ্ধচন্দ্রকেই পতাকায় ব্যবহার করিবার আদেশ দিলেন। সেই অবধি তুরস্ক তথা মুসলমানের পতাকায় অর্দ্ধচন্দ্র ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে (Vide "Muslim Review",—July, 1936)। পৌত্তলিক জাতিদের উপাস্য দেবী চন্দ্রকে পতাকায় ব্যবহার করিতে মুসলমানগণ কোন আপত্তি করেন নাই ও কুণ্ঠিত হন নাই! তাঁহারা শ্রদ্ধেয় মৌলনা আক্‌রম খাঁ সাহেবের মত যুক্তি করিতেন না। কোন একটা সুন্দর বস্তুকে প্রতীকরূপে ব্যবহার করিলে তাহা পৌত্তলিকতার সহিত যে ভাবেই জড়িত থাকুক না কেন—মুসলমানের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কোনরূপ অঙ্গহানি হইত না। মুসলমান পতাকায় চন্দ্রকে ত বহুদিন হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। কিন্তু কোন মুসলমানই চন্দ্রকে পূজা করে না, আর কস্মিনকালেও করিবে সেরূপ না। "পদ্ম ও শ্রীর" ব্যাপারেও মুসলমান কোনও দিনই সরস্বতী ও লক্ষ্মীকে পূজা করে নাই ও ভবিষ্যতেও করিবে না।

(৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকের বিরুদ্ধে যাঁহারা আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান, যে কোন মুসলমানই প্রতীক দেখিয়া

পৌত্তলিকতার প্রতি আকৃষ্ট হন না। ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় যে মনোগ্রাম ব্যবহার করিয়া থাকে, দুষ্টবুদ্ধি দিয়া দেখিলে তাহাতেও পৌত্তলিকতার গন্ধ পাওয়া যাইবে। কোন মনোগ্রামে পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের প্রতীকের সহিত পাশাপাশিভাবে যদি একেশ্বরবাদী মুসলমানের কোন প্রতীক ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে কি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগের অবসান হইয়া যাইবে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মনোগ্রাম আছে, তাহাতে দেখা যায় "স্বস্তিকার সহিত মুসলমানের তথাকথিত একটা প্রতীক আছে। এই স্বস্তিকা ত পৌত্তলিকতার প্রতীক। অথচ ইহার বিরুদ্ধে ত কোন অভিযোগ উঠে না। ইসলামী তথাকথিত প্রতীকের পার্শ্বে আছে বলিয়া কি পৌত্তলিকতা শুদ্ধ হইয়া গেল যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলেন না? তদ্ব্যতীত রাইটার্স বিল্ডিংস-এ যে-সব গ্রীক দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহাকে ইসলামের কোন্ আইন অনুসারে শুদ্ধ করিয়া লওয়া হইয়াছে, এ-কথা কি শ্রদ্ধেয় মৌলানা আক্রম খাঁ সাহেব আমাদিগকে বলিয়া দিবেন? তিনি হয়ত বলিবেন, এগুলি প্রাচীন যুগের স্মৃতি-চিহ্নমাত্র। কিন্তু রাইটার্স বিল্ডিংস-এর প্রতিমূর্ত্তিগুলি ত আর প্রাচীন যুগের রোম-গ্রীসের কোন নামকরা শিল্পীর হাতের গড়া মূর্ত্তি নয়। ইহা ফরমায়েস মত বর্ত্তমান যুগেই নির্ম্মিত হইয়াছে। এগুলির বিরুদ্ধে ধর্ম্মভীরু মৌলানাগণ একদম নীরব কেন? ইহার একমাত্র কারণ—তাহা হইলে উহা যে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হইবে। তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য ত মুসলমানের প্রাণে সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষ জাগাইয়া দেওয়া, সরকারী কাজের সমালোচনা করিলে ত সে উদ্দেশ্য সফল হইবে না। ভারতীয় ব্রিটিশ সরকারের প্রতীক "ইউনিকর্ণ" হইতেছে বর্ব্বর যুগের পৌত্তলিক জাতির ব্যবহৃত প্রতীক। অথচ এ সম্বন্ধেও ধর্ম্মনিষ্ঠ

মৌলানা সাহেবগণ একদম নীরব। মুসলমান যখন ব্রিটিশ জাতির পতাকা "ইউনিয়ন জ্যাককে" সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে, তখন কি সে একবারও ভাবিয়া দেখে না যে, ইহাও পৌত্তলিকতার স্মৃতি-উৎপাদক প্রতীকমাত্র? গত নির্ব্বাচনের সময় মুসলমান প্রার্থিগণ নানারূপ প্রতীক ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেগুলিরও অনেকগুলি পৌত্তলিকতার ভাবোদ্দীপক। মাননীয় মৌলানা আক্‌রম খাঁ'র "মোহাম্মদীর" সাপ্তাহিক ও মাসিক সংস্করণে মাঝে মাঝে পদ্ম, শ্রী, গণেশ ও দুর্গার ছবিসহ বিজ্ঞাপন থাকে, তাহা কোন যুক্তিতে ব্যবহার করা হয়? বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজের "ম্যাগাজিনের" প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদপটে পদ্মসহ হংসের যে ছবিটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা বোধ হয় এখনও মৌলানা সাহেবের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই? যদি কেহ তাহা মৌলানা সাহেবের নিকট পেশ করে, তবে বোধ হয় তাঁহার অভিসম্পাতে সমগ্র ইসলামিয়া কলেজটা ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। যাঁহারা ইসলামকে উদার দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা এই সব প্রতীক দেখিয়া একটুও বিচলিত হইবেন না; অথবা এই সব প্রতীক ব্যবহারে ইসলামের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি একটুও কমিয়া যাইবে না। শ্রদ্ধেয় মৌলানা সাহেবকে আমরা অনুরোধ করি, তিনি যেমন সঙ্গীত ও চিত্র সম্বন্ধে আলোচনায় ওহাবী প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া ইসলামকে একটু উদারভাবে দেখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এক্ষেত্রেও সেইরূপ করুন। তাহা হইলে বুঝিবেন, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, পদ্ম, হস্তী, হংস, গরু, ছাগল, মহিষ প্রভৃতি মুসলমানের চক্ষে সমপর্য্যায়ভুক্ত বস্তু। একটা হইতে অপরটার কোনই পার্থক্য নাই। চন্দ্র আর তারাকে প্রতীকভাবে ব্যবহার করিলে যদি মুসলমানের ইমান বা ধর্ম্মবিশ্বাস নষ্ট না হয়, তবে "পদ্ম ও শ্রী" ব্যবহারেও ইমান নষ্ট হইবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "পদ্ম ও শ্রী" সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা প্রত্যাখ্যান বা বাতিল করিবার কোন কারণ নাই। তাঁহারা যদি প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিতেন যে, হিন্দু সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠত্ব দিবার জন্যই "পদ্ম ও শ্রী" ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা হইলে উহার বিরুদ্ধে আন্দোলনের যথেষ্ট সার্থকতা ছিল। কিন্তু তাঁহারা এবং তাঁহাদের সঙ্গে সমগ্র বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ যখন একবাক্যে বলিতেছেন যে, "পদ্ম ও শ্রী" ব্যবহারের উদ্দেশ্য তাহা নহে, তখন তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া জাতি-বিদ্বেষ সৃষ্টি করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। তাঁহাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যাই প্রমাণ করিতেছে যে, মুসলমানের নৈতিক জয় হইয়াছে। উপস্থিত ব্যাপারটিকে ছাড়িয়া দেওয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

'ইসলাম গেল', 'ধর্ম্ম গেল' বলিয়া এই যে কথায় কথায় আন্দোলন হইতেছে, তাহার গোপন উদ্দেশ্যটা কি? একটু অনুসন্ধান করিলে বুঝা যাইবে—ইহার মূলে সত্যিকারের ধর্ম্মের প্রেরণা নাই,—আছে ধর্ম্মান্ধতার বীভৎস প্রতিক্রিয়া, আর আছে রাজনৈতিক দূরভিসন্ধির জঘন্যতম চালবাজি। মুসলমানের সাহিত্যিক প্রতিভা ও অনৈতিক (non-moral), শিল্প ও সৌন্দর্য্য-বোধকে নষ্ট করিবার জন্য যে ওহাবী প্রভাব আছে, কয়েক বৎসর হইতে গোপন ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছে, বর্ত্তমান আন্দোলনটা তাহারই একটা দিক মাত্র। পিউরিটানগণ যেমন এককালে ইংলণ্ডকে হিব্রু যুগে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল, এই "ওহাবীজম" মুসলমানকে সেইরূপভাবে বর্ত্তমান জগতের সহিত সংস্রব ছিন্ন করিয়া অতীতের কাল্পনিক যুগে লইয়া যাইতে চায়। ইসলামের নামে এই ধর্ম্মান্ধতা যদি আজ সাফল্য লাভ করে, তবে বহুযুগ পর্য্যন্ত মুসলমানের মানসিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। 'পদ্ম ও শ্রী' টা উপলক্ষ্য মাত্র—উদ্দেশ্য ওহাবী

প্রভাবের দ্বারা মুসলমানকে একটা ধর্ম্মান্ধ সম্প্রদায়ে পরিণত করা। জানি না কবে এই ওহাবী প্রভাব হইতে বাঙ্গালার মুসলমান মুক্তি লাভ করিবে, কিন্তু এ-কথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিব, যতদিন ওহাবী প্রভাব হইতে বাঙ্গালার মুসলমান মুক্ত না হইবে, ততদিন তাহার সত্যিকারের জাগরণ হইবে না।

কি পড়িব ও কি পড়িব না

মানুষের বিবেক বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশের পথে যদি নিরন্তর বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়—যদি কেহ সকল সময় প্রতি কাজে মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকে, তবে তাহার প্রতিভার স্ফূরণ হওয়া সুদূরপরাহত। আজ জগতে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, কলা ও সভ্যতার প্রভূত উন্নতি হইয়াছে তাহা মুক্ত মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অমৃতময় ফলস্বরূপ। মানুষ যদি প্রারম্ভে এই স্বাধীনতা না পাইত, যদি সকল অবস্থায় কোন শক্তিমান পুরুষ মানুষকে তাঁহার নিজের নির্দ্দেশিত পথ ব্যতীত অন্য পথে চলিতে না দিতেন, তবে জগতের সর্ব্বত্র মানুষের চিন্তাধারা একই পথে একই ভাবে চলিত—কোথাও একটুও বৈশিষ্ট্য থাকিত না। ফ্যাক্টরীতে প্রস্তুত ফরমায়েসমত একটা কিছু আদর্শের ছাঁচে সব মানুষই গড়িয়া উঠিত, পার্থক্য ও বিভিন্নতা কোথাও থাকিত না। বিবেকহীন পশুপক্ষীর মত প্রত্যেক মানুষ একই ভাবে চলিত, একই বিষয় চিন্তা করিত ও একইভাবে তাহার সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিত। কিন্তু তাহা হইলে জগতের এত উন্নতি হইত না, সভ্যতার বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি হইত না, মানুষের অপার প্রতিভা এরূপ বিচিত্রভাবে রূপ ধারণ করিয়া জগতের বুকে নবযুগ আনয়ন করিত না। স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার অধিকার হইতেই মানুষের এত উন্নতি সম্ভব হইয়াছে, সভ্যতার এরূপ দ্রুত প্রসার হইয়াছে।

মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সভ্যতা ও সংস্কৃতি কোনও দিন কাহারও

নির্দ্ধারিত একটা 'বাঁধাধরা' পথে চলে নাই, তাহাকে নিরন্তর বিপুল বাধার সহিত সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে। মানুষের স্বতঃ উৎসারিত চিন্তাধারার পথে যে সব বাধা আসিয়াছে তাহা প্রতি পদক্ষেপে সভ্যতার গতিকে আড়ষ্ট করিয়াছে, কখন কখন একেবারেই রুদ্ধ করিয়াছে। কোন কোন মানুষের স্বভাব এমনি যে, সে নিজে যাহা ভাল বলিয়া মনে করে, সকলকেই তাহাই করিতে বাধ্য করে। সে মনে করে—ভাল বুঝিবার তাহার যে ক্ষমতা আছে, অপরের তাহা নাই। শ্রেষ্ঠ বিষয় যাহা, তাহা কেবল সে-ই চিন্তা করে, এবং তাহার চিন্তার সহিত বিরোধ বাধে এমন সব বিষয়কে সে মনে করে ভ্রান্ত, মন্দ ও ক্ষতিকর। সুতরাং সে অপরের চিন্তাকে দমন করিবার চেষ্টা করে এবং তাহাকে জোর করিয়া নিজের চিন্তাপ্রসূত বিষয় শিক্ষাদান করে। এইভাবে অঙ্কুরেই কত প্রতিভা বিনষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অপরকে দাবাইয়া তাহাকে নিজের মতে দীক্ষিত করিবার এই আদিম ও বর্ব্বর প্রবৃত্তি আজিও বহু মানুষের মতে প্রবল হইয়া আছে। দোর্দ্দিণ্ডপ্রতাপে মানুষের স্বাধীন চিন্তা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে রাজশক্তির দ্বারা, ধর্ম্মশাসন দ্বারা ও সামাজিক অত্যাচার দ্বারা। এই ত্রি-শক্তির প্রভাব হইতে মানুষের বুদ্ধিকে মুক্ত করিতে না পারিলে সভ্যতার চরম বিকাশ কোনও দিনই হইবে না।

পুস্তকই হইতেছে মানুষের চিন্তাবিকাশের শ্রেষ্ঠ পন্থা। প্রতিভাবান মানুষ তাঁহার আয়াসলব্ধ চিন্তাধারাকে সাধারণতঃ পুস্তকেই প্রকাশিত করেন, অথবা তাঁহার হইয়া অন্য কেহ সেগুলিকে পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করেন, তাহাই ত্রিকাল জয় করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছে। এই চিন্তাধারা যাবৎ পুস্তকের পৃষ্ঠায় রূপ গ্রহণ না করে, তাবৎ তাহা একটা সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। তখন তাহার উপর এত প্রচণ্ড বাধা

সম্ভব হয় না। কিন্তু সেই চিন্তা ও জ্ঞানরাশি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলেই, তখন নানাভাবে তাহাকে বাধা দেওয়া হইয়া থাকে। রাজশক্তি নানা আইন প্রণয়ন করিয়া পুস্তক প্রচারে বাধা প্রদান করেন। তদ্ব্যতীত সমাজশাসন ও ধর্ম্মশাসন,—ন্যায় নীতি, সুরুচি ও সংস্কৃতির নামে পৃথিবীর অনেক জ্ঞানগর্ভ পুস্তক-প্রচারে বাধা দিয়াছে, কখন কখন ভাল ভাল পুস্তকের বিরুদ্ধে বয়কট আন্দোলন চালাইয়াছে। এই বাধার কারণে, মানুষের জ্ঞানবিকাশের সহায়ক বহু পুস্তক বহু লোকের নিকট অদ্যাপি অপঠিতই রহিয়াছে। নিজ প্রভাবাধীন ব্যক্তিকে আমরা নিজেদের রুচি-সম্মত পুস্তক ব্যতীত অন্য পুস্তক পড়িতে দিই না এবং পড়িতে গেলে বাধা দিয়া থাকি। এ বিষয়ে 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' সম্বল অভিভাবকগণ বিশেষ সিদ্ধহস্ত—তাঁহারা অধীনস্থ ব্যক্তিগণকে কতকগুলি পুস্তক সম্বন্ধে সর্ব্বদা সতর্ক করিয়া দেন,—তাঁহাদের নির্দ্ধারিত পুস্তকই পড়িতে হইবে—অবশিষ্টগুলি একেবারেই পরিত্যজ্য। এই জন্য অপর ধর্ম্মের গ্রন্থাবলী সহজে কেহ পড়িতে পায় না। কোরান, গীতা, বাইবেল প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থাবলীর শিক্ষা হইতে বিভিন্ন ধর্ম্মের কোমলমতি বালকেরা একেবারেই বঞ্চিত হয়। ফলে পরিণত বয়সে ইহারা যখন অপর ধর্ম্মের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে, তখন সেই সেই ধর্ম্মের মন্দ দিকটা খুঁজিবার জন্য ব্যস্ত হয়। এইভাবে বিবিধ পুস্তক পাঠের পথে নিরন্তর বাধা উপস্থিত হয় বলিয়া লোকের স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণ হয় না, কাহারও কাহারও তাহা একেবারেই লোপ পায়, কেহ ঘোর সঙ্কীর্ণচেতা হইয়া পড়ে। নিরপেক্ষ-ভাবে সমালোচনা করিবার প্রবৃত্তি লোকের মনে জাগ্রত হয় না, কেহ সুস্থির ও অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া কোনও স্বাধীন মত গঠন করিতে পারে না। ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার নামে "কি পড়িব ও কি পড়িব না" তাহা নির্দ্দেশ

করিতে গিয়া আমাদের সমাজপতিরা জ্ঞান ও শিক্ষার মুণ্ডপাত করিয়া থাকেন।

মধ্যযুগে খ্রীষ্টান ইউরোপ, তাহার প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য পোপের প্রভাবে কত মূল্যবান পুস্তককে যে অগ্নিদগ্ধ করিয়াছিল এবং কত নিরপরাধ লেখক ও নিষিদ্ধ পুস্তকের পাঠক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বহুকাল পর্য্যন্ত সমগ্র দেশে বাইবেলই একমাত্র পঠিতব্য গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত ছিল। তারপর মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে যখন রাশি রাশি পুস্তক প্রকাশিত হইতে লাগিল, তখন এই অবাধ প্রকাশের পথ রোধ করিবার জন্য নানারূপ কৌশল অবলম্বন করা হইল ;—সেই উদ্দেশ্যে বহু সেন্‌সাস বোর্ড স্থাপিত হইয়াছিল। লেখকগণকে পুস্তক মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে এই বোর্ডে তাহাদের পাণ্ডুলিপি পেশ করিতে হইত। বোর্ড সম্মতি দিলে তবেই পুস্তক মুদ্রিত হইতে পাইত। অন্যথায় সে পুস্তক আর পৃথিবীর আলোক দেখিতে পাইত না। ইহা ছাড়া তাঁহারা মধ্যে মধ্যে নিষিদ্ধ ও পঠিতব্য পুস্তকের একটা তালিকা প্রস্তুত করিতেন, সেই তালিকার নিষিদ্ধ পুস্তক কেহই পড়িতে পাইত না। এই ভাবে বহুকাল ধরিয়া পুস্তকের উপর হিটলারী শাসন চলিতে থাকে—তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ শিক্ষা, জ্ঞান ও সভ্যতা আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল।

ইউরোপের যে যুগকে বলা হয় 'রিনেসাঁ'-এর যুগ সেই যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, সেখানে একদিকে যেমন জ্ঞান ও বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, ঠিক অন্যদিকে অন্য ভাবে নানাবিধ অত্যাচার দ্বারা সেই জ্ঞান-বুদ্ধিকে আড়ষ্ট ও সীমাবদ্ধ করিবার জন্য কোনও রূপ চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। রিনেসাঁর প্রভাবে নব উন্মেষিত জ্ঞানের আলোকে পোপ-শাসিত সমস্ত খ্রীষ্টান ইউরোপ মাথা

জুলিয়া দাঁড়াইতে আরম্ভ করিল, গতানুগতিকতায় সে বিশ্বাস হারাইতে লাগিল, অনন্ত কল্পনা, অফুরন্ত আশা, দুঃসাহসিক চিন্তাধারা ইউরোপের সম্মুখে এক নূতন লোকের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। কিন্তু জ্ঞান বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলগণ তখন একেবারেই চুপ করিয়া বসিয়া ছিল না। তাহারাও তাহাদের বজ্র অস্ত্র,—পুস্তক বাজেয়াপ্ত-করণ, লেখক ও পাঠককে দগ্ধ-করণ—প্রয়োগ করিতে দিনেকের তরে ক্ষান্ত থাকিল না। এই বাধা না থাকিলে ইউরোপ বহু পূর্ব্বে জাগ্রত হইতে পারিত। এই নূতন চিন্তাধারার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে সমগ্র খ্রীষ্টান ইউরোপের বিরুদ্ধে মার্টিন লুথার প্রথম মহাযুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তারপর ইউরোপের কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাস। এই কোন্দল-কোলাহল ও ধর্ম্মান্ধতার কারণে নব-প্রেরণা-প্রাপ্ত জ্ঞানরাজি স্তব্ধ হইয়া রহিল, এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। প্রত্যেক সম্প্রদায় অপরের পুস্তকরাশি দগ্ধীভূত করিয়া বর্ব্বরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষার নামে, "কি পড়িব ও কি পড়িব না"—ইহারই মীমাংসা করিতে গিয়া ইউরোপ কিছুদিনের জন্য স্বাধীন চিন্তার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল।

ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ইউরোপের সর্ব্বত্র লেখক, পাঠক ও গ্রন্থের উপর শ্যেনদৃষ্টি রাখা হইত। গ্রন্থকে স্বাধীনতা দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে আন্দোলনও হইত, এই উদ্দেশ্যে মহাকবি মিল্টন তাঁহার 'Aereopagitica' প্রণয়ন করেন, কিন্তু অরণ্যে রোদনের ন্যায় ইহাতে কোন ফল হয় নাই! ফরাসী বিপ্লবের পর ইউরোপ একটু প্রকৃতিস্থ হইলে গ্রন্থের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞাগুলি ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইয়া গেল এবং ইউরোপ স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার পাইল। এখন পুস্তক

নির্ব্বাচনের ভার শাসক অথবা যাজকের হাতে নাই, পাঠকের রুচির উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

তোমাকে কি পড়িতে হইবে, আর কি পড়িতে হইবে না—এই সমস্যার মীমাংসা কে করিবে? রাজশক্তি দিবেন বাধা, সমাজ দিবে বাধা, ধর্ম্ম করিবে অনন্ত নরকে প্রেরণ—তোমার মুরুব্বি দিবেন তোমাকে দণ্ড—এই সব বাধা-বিঘ্ন, দণ্ড ও ভয়কে সমীহ করিয়া যদি তোমাকে চলিতে হয়, যদি এই সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া তোমাকে পুস্তক নির্ব্বাচন করিতে হয়, তবে তোমার ভাগ্যে পড়িবার মত পুস্তক পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যাইবে না। কারণ এতগুলি বাধা অতিক্রম করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা হয় সংখ্যায় অতি নগণ্য, অথবা তাহার সৌন্দর্য্য অতি সামান্য; কিম্বা তাহা তোমার রুচির এরূপ বিপরীত যে, তুমি তাহাতে একটুও তৃপ্তি পাইবে না। এমতাবস্থায় কোনও পুস্তক না পড়াই মন্দের ভাল। রাজশক্তির দ্বারা নিষিদ্ধ পুস্তকের কথা তুলিবার কোনও উপায় নাই। কিন্তু তদ্ব্যতীত অবশিষ্ট পুস্তকগুলি সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে দু' একটা কথা আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

যাহাদের স্বাধীনভাবে বিবেচনা করিবার শক্তি পুষ্ট হয় নাই—যাহাদিগের প্রতি কাজ এখনও নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়, সেই সুকুমার-মতি বালকদের জন্য কতিপয় পুস্তক নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া দোষাবহ নহে—বিশেষত আদি রসাত্মক পুস্তকাবলী। যে সমুদয় পুস্তকে ন্যায়, নীতি ও ধর্ম্মের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছে, পাপ ও ব্যভিচারকে লোভনীয় করিয়া দেখান হইয়াছে, নরনারীর যৌন সম্বন্ধটা নগ্নভাবে প্রকটিত করা হইয়াছে, অথবা অপর ধর্ম্মকে অযথা নিন্দা করা হইয়াছে, সে সমুদয় পুস্তক বালক-বালিকাদিগকে পড়িতে দেওয়া মোটেই উচিত নহে। যাহাতে

স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা জাগে, ন্যায় সত্যের প্রতি আগ্রহ জন্মে, সেই সব পুস্তকের প্রতি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ও স্বাধীনভাবে মতামত গঠন করিবার মত ক্ষমতা জাগ্রত হইলেই এই নিষেধ তুলিয়া দিতে হইবে। তারপর তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে তাহাদের নিজেদের রুচির উপর—তাহারা নিজ নিজ রুচি ও শক্তি অনুযায়ী আপন আপন পড়িবার পুস্তক বাছিয়া লইবে। তাহাদের জন্য শতখানি উৎকৃষ্ট পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত করিবার কোন দরকার নাই, শ্রেষ্ঠ পুস্তক তাহারাই বাছিয়া লইবে। কিন্তু যদি তাহাদিগকে প্রতিপদে বাধা দেওয়া হয়, যদি তাহাদের হইয়া শ্রেষ্ঠ পুস্তক বাছিয়া দেওয়া হয়, তবে তাহাদের প্রতিভা ও স্বাধীন মতের বিকাশ হইবে না, তাহারা চিন্তা করিতে শিখিবে না, অপরের ধারকরা বিদ্যায় পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিবে বটে, কিন্তু তাহাতে দেশকে ও জাতিকে কিছুই দান করিতে পারিবে না।

আমাদের মুসলমান সমাজের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য এই যে, অদ্যাবধি সমাজ মধ্য-যুগীয় আদর্শ দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। কি পড়িতে হইবে ও কি পড়িতে হইবে না—এই বিষয়ে আমাদের সমাজপতিরা সমাজকে সব সময়ে একটা খামখেয়ালীপূর্ণ নির্দ্দেশ দিতে চান। তাঁহাদের নির্দ্দেশ অমান্য করিলেই তাহার জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা দেওয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগে যখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র মতের ও চিন্তার স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে, তখন একদল পুরোহিত গোছের লোক ধর্ম্মের নামে মুসলমানের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছেন, তাহার মনোবৃত্তির উপর পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন। চিরাচরিত পথের একটুও বাহিরে যাইবার উপায় নাই। তাহা হইলে মৌলবী ও খুদে মৌলবীদের ফতোয়া আসিয়া তাহাকে

'কাফের' না বানাইয়া ছাড়িবে না। অন্য সব বিষয়ের মত মুসলমানের জন্য পুস্তক নির্ণয়ে তাঁহাদের তৎপরতা ও কার্য্যকুশলতা মধ্যযুগের পোপকেও হার মানাইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রের খুঁটিনাটি চুলচেরা বিচার করিতে করিতে বর্ত্তমান সম্বন্ধেও তাঁহাদের সমস্ত জ্ঞান লোপ পাইয়াছে। সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহাদের কোনও স্পষ্ট ধারণা নাই। দুই একখানা প্রাচীন আরবী ফারসী গ্রন্থই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব পুঁজি। এই সামান্য পুঁজি লইয়াই তাঁহারা মুসলমানের জ্ঞান-সাধনার পথে প্রবল পর্ব্বতের মত বাধা সৃষ্টি করিতে চাহিতেছেন। তাঁহাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অনুরূপ না হইলে তাঁহারা সকলবিধ শিক্ষাকেই "পৌত্তলিক" আখ্যা দিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন। পোপের মত তাঁহারা নির্দ্দেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, 'অমুক পুস্তক পড়, আর অমুক পুস্তক স্পর্শ করিও না'; তাঁহাদের নিকট কতকগুলি "বিশেষ অনুমতি প্রাপ্ত" পুস্তক আছে, তদ্ব্যতীত অন্য পুস্তক পড়িলেই সমাজ অধঃপাতে যাইবে, সংস্কৃতি হারাইতে বসিবে, এইরূপ ভাবে তাঁহারা সমাজকে সাবধান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর মৌলবী-মোল্লাদের প্রচারের ফলে মুসলমান সমাজের মধ্যে সত্যিকার ভাবে কোনও জাগরণ হইতেছে না, তাহার চিন্তাশক্তির বিকাশ হইতেছে না; আর যতদিন সমাজে ইঁহাদের প্রভাব থাকিবে, ততদিন এই সর্ব্বনাশকর ধর্ম্মান্ধতা দুর হইবে না।

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের বিরুদ্ধে এক "জেহাদ" আরম্ভ হইয়াছে। সেখানে নাকি এমন সব বিষয় পড়ান হয়, যাহার কারণে মুসলমানের ধর্ম্ম, 'কালচার' ইত্যাদি কিছুই থাকিবে না, হিন্দুদের লেখা পড়িলে মুসলমান নাকি 'কাফের' হইয়া যাইবে, অতএব মুসলমান সাবধান! আমরা এই অভিযোগগুলি মনোযোগ সহকারে পড়িলাম, পাঠ্য পুস্তকগুলিও

পড়িলাম,—কিন্তু অভিযোগগুলি সমর্থন করিবার মত কিছুই পাইলাম না। মনে হইল, যাঁহারা অভিযোগ করিয়াছেন, হয় তাঁহারা সাহিত্য-সমালোচক ও সাহিত্যজ্ঞ পণ্ডিত নহেন, অথবা তাঁহারা ঘোর ধর্ম্মান্ধ, মানসিক শক্তি উন্মেষক শিক্ষা (Liberal education) সম্বন্ধে কোন সংবাদই রাখেন না। ইসলাম ব্যতীত পৃথিবীতে অন্য ধর্ম্ম যাহা আছে তাহা সবই পরিত্যজ্য—এই যদি তাঁহাদের নীতি হয়, তবে আর কি বলিব! ইসলাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতে পারে, কিন্তু অন্য কোথাও যে কিছু শিখিতে হইবে না এমন কথা ইসলামের কোথাও নাই। বরং ইসলামের কাণ্ডারী হজরত মহম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন—"যদি চীনদেশে যাইতে হয়,তবে সেখানে গিয়াও জ্ঞান আহরণ কর।" হজরতের এই বাণীর কি কোনই সার্থকতা নাই? আমাদের সমাজের নির্দ্দেশমত মুসলমান যদি হিন্দুদের লেখা বিশেষতঃ তাহাদের সাধু-সজ্জনের পরিচয়মূলক সাহিত্য পড়িতে কুণ্ঠিত হয়, তবে পৃথিবীর কতকগুলি উৎকৃষ্ট সাহিত্যের রসাস্বাদন হইতেই তাহারা বঞ্চিত হইবে, ইহাতে হিন্দুদের কোন অনিষ্ট হইবে না। এ স্থলে আমার মতামত পরিষ্কারভাবে মুসলমান সমাজকে জানাইতেছি। কাহারও কবিতা এবং রচনা পাঠ করিতে হইবে তাহাদের নিজস্ব সৌন্দর্য্য ও অনুপম মাধুর্য্যের জন্য। লেখকের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করিবার কোনই দরকার নাই। শেলির "প্রোমিথিয়াস আন্‌বাউণ্ড" কাব্যখানিতে সকল ধর্ম্মের পূজ্য ভগবানকে ব্যঙ্গচ্ছলে অনেক কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া সেই অমূল্য কাব্যকে বর্জ্জন করা মূর্খতার পরিচায়ক; সুতরাং লেখার মধ্যে কাহার প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছে, অথবা কাহার প্রশংসা করা হইয়াছে তাহা দেখিলে চলিবে না,—দেখিতে হইবে লেখাটা সুষমামণ্ডিত কি না; আমরা তাহা পড়িব এই সুষমাটুকুর জন্য। কোনও উৎকৃষ্ট রচনা পড়িতে হইলে,

অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতে হইলে আনুষঙ্গিক যে সব জ্ঞান দরকার সে সম্বন্ধে কিছু কিছু পড়িতে হইবে—নতুবা ঠিকমত তাহার রসাস্বাদন করা সম্ভব হইবে না। ভাল ভাল ইংরেজী সাহিত্যের রস আস্বাদন করিতে হইলে রোম, গ্রীস ও বাইবেলের অনেক উপকথার বিবরণ জানা দরকার। যশস্বী লেখকগণ বিভিন্ন দেশের সাহিত্য, ইতিহাস ও পৌরাণিক বিবরণ হইতে বাছাই বাছাই ভাব, উপমা ও শব্দসম্ভার স্ব স্ব রচনার মধ্যে এরূপ সন্তর্পণে প্রবেশ করাইয়া দেন যে, তাহাদের সংবাদ না রাখিলে সেই সাহিত্য সকলের বোধগম্য হইবে না। আর সেইটুকু জানিলেই লেখার অর্থ পরিষ্কার হইয়া যাইবে। যখন মেকলে সাহেবের "Essay on Milton" প্রকাশিত হইল, তখন একজন বৃদ্ধ পাঠক, অতিকষ্টে দুই একখানি প্রাচীন গ্রন্থের সাহায্য লইয়া তবেই মেকলে পড়িয়া আনন্দ পাইয়াছিলেন। লেখকের ব্যবহৃত উপমাটি ঠিকমত বুঝিতে না পারিলে পাঠকের সমুদয় সাধনা পণ্ডশ্রম হইবে।

ইংরেজীর বেলায় যাহা প্রযোজ্য, বাঙ্গলা সাহিত্যের বেলায়ও তাহাই প্রযোজ্য হইবে। অর্থাৎ বাঙ্গলা সাহিত্য উপভোগ করিতে হইলে, এ দেশের লেখকগণ যে সব গল্পকাহিনী হইতে উপমা ও সাদৃশ্য এবং ভাব-মূলক তথা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাও কিছু কিছু অবশ্যই জানিতে হইবে। হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনী-আদি পড়িলে কাহারও ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই—এইগুলি সাহিত্যের সম্পদ, সাহিত্য বুঝিতে সহায়তা করে। সেই জন্য তাহা বাঙ্গলা ভাষার প্রত্যেক পাঠকেরই জানা দরকার। মুসলমান আজ কয়েক যুগ হইতে হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনী পড়িয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহাতে যে কোনও মুসলমান হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে—এমন কথা কেহই বলিতে পারিবে না;

মুসলমানের হিন্দু বিরোধিতা একটুও কমে নাই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। মুসলমানের সাহিত্য আজিও ভালভাবে গড়িয়া উঠে নাই সত্য, কিন্তু যে দিন সে সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে, সে দিন মুসলমানের ব্যবহৃত উপমাগুলি বুঝিবার জন্য রসপিপাসু হিন্দু, মুসলমানী উপকথাকে অবহেলা করিতে পারিবে না, তাহারাও অতীব আগ্রহ সহকারে তাহার সহিত পরিচিত হইবে। আজ রোম, গ্রীস ও বাইবেলের সহিত পরিচিত হইয়াও হিন্দু যেমন খৃষ্টান হইয়া পড়িতেছে না, সে দিন এদেশের হিন্দু ও মুসলমান একে অপরের ধর্ম্মশাস্ত্র ও সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইয়াও নিজ নিজ ধর্ম্মে আস্থা হারাইবে না। আজ হিন্দুরা আমাদের সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইতে চাহিতেছে না বলিয়া কি আমরাও বাঙ্গলা দেশের হিন্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইব? বড়ই দুঃখের কথা, এ বিষয়ে একদল অ-সাহিত্যিক আসিয়া সাহিত্যের উপর অন্যায় অযথা মোড়লী করিতেছেন। তাঁহাদের এই মোড়লী অনধিকার চর্চ্চা ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। বাঙ্গালী মুসলমানকে কি পড়িতে হইবে আর কি পড়িতে হইবে না—তাহার নির্দ্দেশ দিবার এই সব মৌলবী ও মৌলানাদের কোনও অধিকার নাই। প্রত্যেকে আপন রুচি ও মত অনুযায়ী নিজের নিজের প্রয়োজনীয় গ্রন্থ বাছিয়া লইবে। মৌলবীদের নির্দ্দেশ সমাজের ক্ষতি করিবে—স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ করিবে—ইহাতে মুসলিম সংস্কৃতির একটুও শ্রীবৃদ্ধি হইবে না, বরং তাহা কুপমণ্ডুকতার বিষাক্ত আবহাওয়ায় ধ্বংস হইয়া যাইবে।